খিদেরা

আবীর রায়



Skeleton



Skeleton

সূচিপত্র



প্রার্থনা	০৯
বলিদান	৪৩
ঘিদরা	৭৩

প্রার্থনা



মিশকালো মেঘে ঢেকে রয়েছে আকাশ। শহরের রাজপথের আলো এতদূরে আসে না। রাত দু'প্রহর পেরিয়ে গেছে। গভীর ঘুমে ডুবে রয়েছে পুরী শহর। বালিয়াড়ির পেছনে চাঁদের মতো বেঁকে গেছে সমুদ্র। কুচকুচে কালো অথৈ জলরাশি গর্জন করে একের পর এক ঢেউ ভেঙে চলেছে ভেজা বালির ওপরে। নোনা হাওয়ায় পেছনের ঝাউবনের মাথাগুলো আছাড় খাচ্ছে ডান দিক থেকে বামে। সমুদ্রের পাড় ধরে যতদূর চোখ যায় শুধু ঢেউ খেলানো বালি। উত্তর দিকে বহু দূরে শহরের রাজপথ। নির্জন সমুদ্রতটে হাওয়ার শব্দ আর ঢেউয়ের গর্জন ছাপিয়ে একটা শব্দ এক টানা হয়ে চলেছে।

খচ্ খচ্ খচ্...

ঝড়ে ভেঙে পড়া শুকিয়ে যাওয়া একটা ঝাউগাছের গুড়ির পাশে জনা দশেক লোক জড়ো হয়েছে। অন্ধকারে কারোর মুখ পরিষ্কার দেখা যায় না।

তাদের চাপা ফিসফিসে স্বরে কথাবার্তা ঢেউয়ের শব্দ পেরিয়ে একে অপরের বেশি কারোর কানে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। মানব-বলয়ের মাঝে একজন নিচু ছোট একটা বেলচা মতন যন্ত্র দিয়ে উপুড় হয়ে বালি খুঁড়ে যাচ্ছে। এক মনে... নির্বাকভাবে।

খচ্ খচ্ খচ্...

সৈকত থেকে বহু দূরে সাগরের মাঝামাঝি আকাশ ফালি হয়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তার কর্কশ শব্দ কানে আসতেই একে একে মানব বলয়ের সকলে একে অপরের হাত ধরতে লাগল। গর্তের চারপাশে ছোট হয়ে এল বৃত্ত। যে বালি খুঁড়ছিল সে কিন্তু গর্তের বাইরে উঠে এল না। তার খোঁড়া গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়েই গায়ে চাপানো ময়লা জোব্বার ভেতর থেকে বালি মাখা দুটো রিক্ত হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিল। বলয়ে দাঁড়ানো একজন বুকের কাছ থেকে বের করল ঢাকনা দেওয়া একটা বড়সড় কালচে পাথরের পাত্র। পাত্রটির দর্শন পেতেই গর্তের মধ্যে দাঁড়ানো ব্যক্তির মুখের অভিব্যক্তির পরিবর্তন এই অন্ধকারেও স্পষ্ট বোঝা গেল। চকচক করে উঠল ক্লান্ত চোখ দুটো। পাত্রটি তার বাড়ানো হাতের উপর রাখা মাত্রই যেন তার সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল!

পাত্রটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল সে! এবার একসাথে গোঙানির মতো সুর করে দুর্বোধ্য ভাষায় সকলে সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করল। সকলের গলা একসাথে উঠছে, নামছে। সে মন্ত্রের একটা শব্দও আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু তার ঝঙ্কারে যেন সাগরের উথাল পাথাল আরও কয়েকগুণে বেড়ে গেল। বলয়ের মধ্যমণি পাত্রটি বুকে জড়ানো অবস্থাতেই এবার ধিরে ধিরে নিজের খোঁড়া গর্তের মধ্যে শুয়ে পড়ল। ঠান্ডা বালিতে এলিয়ে দিল নিজের শরীর। বেড়ে গেল মন্ত্রোচ্চারণের দমক!

হঠাৎ জঙ্গলের বুক চিরে উত্তাল হাওয়ার দমক এসে আছড়ে পড়ল সমুদ্র সৈকতে। যেন এক ঝটকায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সবাইকে। আকাশ বাতাশ বালির মেঘে ঢেকে গেল। হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানব-বলয় কিন্তু এতটুকু নড়ল না। এই বীভৎস তুফানের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চলতে থাকল

মন্ত্রোচ্চারণ! শুয়ে থাকা ব্যক্তির দেহের ওপর একটু একটু করে বাড়তে লাগল বালির আস্তরণ। ঢেকে যেতে লাগল গর্ত। পিঠ, কোমর, গলা, গাল শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ চলে যেতে লাগল বালির তলায়। বলয়ের সকলের নজর গর্তের দিকে। কিন্তু কেউ তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে না। সকলের মুখে যেন এক পৈশাচিক উল্লাস আর উত্তেজনা! গর্তে শুয়ে থাকা ব্যক্তি একটুও নড়ল না... কোনও এক ভয়াল অহং যেন তাকে বারবার বুঝিয়ে চলেছে যে তার মৃত্যু বীরের! তার শরীর বালির তলায় চলে গিয়ে নাকের ডগাটুকুও পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু বুকে ধরা পাত্রের আগাটুকু জেগে রইল বালির ওপর। ঝড় থামার বদলে যেন আরো কয়েকগুণ বেড়ে উঠল।

বলয়ের একজন এবার সমুদ্রের দিকে ঘুরে এক হাত আকাশের দিকে তুলে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠতেই সমুদ্র বেশ কয়েক যোজন পিছিয়ে গেল... থেমে গেল মন্ত্রোচ্চারণ। সকলের নজর সমুদ্রের দিকে ঘুরে গেল। পাড় থেকে প্রায় এক মাইল দূরে হঠাৎ কুচকুচে কালো পাহাড়ের মতো ঢেউ মাথা তুলতে আরম্ভ করল!

পায়ে পায়ে সকলে এইবার পিছু হঠতে আরম্ভ করল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে এবার কানে এল রাক্ষুসে ঢেউয়ের গর্জন। বলয় ভেঙে উলটো মুখে পালাতে আরম্ভ করল সবাই। দেখতে দেখতে অতিকায় দানবের মতো ঢেউ আছড়ে পড়ল বালির ওপর... গোটা বালিয়াড়ি ঢেকে জলের তোড় ঢুকে পড়ল ঝাউবনের ভিতরে! জলোচ্ছ্বাসে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে যে ক'জন প্রাণে বাঁচল, জল নেমে যেতে তারা দেখল গোটা সমুদ্রতট মসৃণ হয়ে গেছে। মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলো বেরোতে বালির ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা গাছের ডালের টুকরো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না...

শুধু জঙ্গলের ওপরে চাঁদের আলোয় চিকচিক করতে দেখা গেল বহু দূরে মন্দিরের চুড়োয় অবস্থিত সুদর্শনকে। উদ্দাম হাওয়ায় যার গা লেপটে উড়ে চলেছে পুরীর পতিতপাবন রাজধ্বজা!

* * * * * * * * * *

জগন্নাথের নবকলেবর এই বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর। সেই উপলক্ষে রথের একহপ্তা আগে পুরীতে এসে উপস্থিত হল কৃপাসিন্ধু। পথে একজন বাঙালি ভ্রমণ কাহিনীকারের সাথে তার আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক বললেন ওনার শৈশব খুরদায় কেটেছে। কাজেই উনি উড়িয়া পড়তে এবং বলতে বেশ সক্ষম। ভদ্রলোক কৃপার ব্যাপারে অনেক কথা জানতে চাইছিলেন; নবকলেবর সম্পর্কে সে কী কী জানে, তার শৈশব কোথায় কেটেছে, এত অল্প বয়সে কেন সে সংসারত্যাগী হয়েছে... এসব। কৃপা বরাবরই নতুন মানুষের সাথে বার্তালাপ করতে ভালোবাসে, কাজেই একটুও বিরক্ত না হয়ে ভদ্রলোককে নিজের ব্যাপারে সমস্ত সে বলেছিল। কীভাবে টানাটানির সংসারের চার ভাইবোনের সবচেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও সে বারো ক্লাস অব্দি পড়াশুনো করে, কীভাবে কলকাতা ইসকনের প্রভু চিন্ময়ানন্দর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, কীভাবে তিনি কৃপাকে সন্ন্যাস নিতে উদ্বুদ্ধ করেন, কীভাবে মাত্র আঠারো বছর বয়সে দীক্ষা নিয়ে পরিবার ত্যাগ করে, কীভাবে আজ সাড়ে-তিনবছর ইসকনের সেবাইত হয়ে সে সাত্ত্বিক জীবন কাটিয়ে চলেছে। কৃপা ভদ্রলোককে এও বলল যে গতবারের মতো এবারের নবকলেবর অষ্টগ্রহ সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ যখন সৌরমণ্ডলের যে কোনো আটটি গ্রহ এক সমান্তরালে এসে যায়। গত নবকলেবরও কাকতালীয় ভাবে অষ্টগ্রহ সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে তখন কৃপা জন্মায়নি। চব্বিশ বছর অন্তর দু দুবার অষ্টগ্রহ সমন্বয় সত্যিই বড় আশ্চর্যের, কারণ এমনটা আবার নাকি ২৫১২ সালে হবে!

'নব' অর্থে নূতন, 'কলেবর' অর্থে শরীর। দুয়ে মিলে 'নবকলেবর'। যখন জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের পুরনো মূর্তি সরিয়ে নতুন মূর্তি স্থাপন হয়। এর উপাচারও নেহাত কম নয়। মন্দিরের দৈতাপতিরা স্বপ্নে আদেশ পায় কোন স্থানের কোন 'দারু' বা গাছ থেকে কাঠ সংগ্রহ করা হবে মূর্তি নির্মাণের জন্য। জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম ও সুদর্শন এর আলাদা আলাদা মূর্তির জন্য আলাদা আলাদা স্থান থেকে দারু চয়ন করা হয়। তারপর সেই গাছ বলদের গাড়িতে চাপিয়ে কীর্তন আর মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শোভাযাত্রা সহকারে

মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। পনেরো দিন ধরে কর্মকারেরা মন্দিরের গোপন কুঠুরিতে সে কাঠ কেটে দেবমূর্তিকে রূপদান করতে থাকে আর বাইরে চলতে থাকে দেবদাসীদের ভক্তিগীতি আর অষ্টপ্রহর মন্ত্রোচ্চারণ। মূর্তি নির্মাণকালে না কর্মকারদের কেউ কুঠুরির বাইরে আসতে পারে, না বাইরে থেকে কেউ ভেতরে যেতে পারে।

তারপর আসে নবকলেবর অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গোপনীয় আর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা 'ব্রহ্ম পরিবর্তন'। রথের তিনদিন আগে অমাবস্যার মাঝরাতে 'পতি মহাপাত্র' বা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দু'জন দৈতাপতির সাথে প্রবেশ করেন মন্দিরের গর্ভগৃহে। পুরনো মূর্তি এবং নতুন মূর্তিকে দাঁড় করানো হয় মুখোমুখি। গর্ভগৃহের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, আটকে ফেলা হয় অন্য সমস্ত জানলা বা ঘুলঘুলি। নিভিয়ে ফেলা হয় ভেতরের সমস্ত আলো। তিনজন বেঁধে ফেলেন নিজেদের চোখ। বাইরে চলতে থাকে বৈদিক মন্ত্রপাঠ। পতি মহাপাত্র তারপর খুলে ফেলেন পুরনো বিগ্রহের বুকের মধ্যে অবস্থিত একটি চোরা খুপরি। সেই খুপরির ভেতরে যে আদৌ কি বস্তু রাখা থাকে তা কেউ জানে না। শুধু যিনি ব্রহ্ম পরিবর্তন করেন, খুপরিতে হাত ঢোকাতেই তাঁর মনে হয় যেন জীবন্ত কোনও তেজরাশি তাঁর হাতে উঠে আসে। চোখ বাঁধা অবস্থাতেই সেই অজ্ঞাত বস্তু চালান করা হয় নূতন কলেবরের বুকের খুপরিতে। তারপর সে খুপরির দরজা ভালো করে আটকে তবে চোখ খোলেন তিনজন। পূর্বে যে সকল পতি মহাপাত্র ব্রহ্ম পরিবর্তন করেছেন তাঁদের কারোর মনে হয়েছে সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাওয়ার অনুভূতি হয়েছে, কেউ বলেছেন তাঁর মাথা হাল্কা লাগার অনুভুতি হয়েছে, কারোর আবার মনে হয়েছে যেন তাঁর হাতের তালুতে সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ বিরাজ করেছে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর রাত শেষ হওয়ার আগে পুরনো মূর্তি বিসর্জন করা হয় 'কৈলী বৈকুণ্ঠ' নামক মন্দির সংলগ্ন গহ্বরে। তারপর নতুন মূর্তির অভিষেক করে গর্ভগৃহে স্থাপন করে মন্দির পুনরায় খুলে দেওয়া হয় রথের আগে।

কৃপা পুরীতে আগেও বার দুয়েক এসেছে। কিন্তু এবার যেন সবকিছু বড়

অদ্ভুত ঠেকতে লাগল তার। রথ উপলক্ষে ইতিমধ্যেই ভিড় বাড়তে আরম্ভ করেছে শহরে। কিন্তু স্থানীয়দের মধ্যে কৃপা একটা বেমানান রকম ঝিমঝিমে ভাব লক্ষ করেছে যা আগে কখনো সে অনুভব করেনি। এই সময় পুরীর ব্যবসা-বাণিজ্য তুঙ্গে থাকার কথা কিন্তু গত দু'দিনে স্বর্গদ্বারের অর্ধেকের বেশি দোকান সে বন্ধ দেখেছে। রাস্তার আলো জ্বলছে না। পথঘাট ময়লা, নোংরা— যেন সাফসুত্র রাখার গরজ কারোর মধ্যে নেই। ইসকনের যেই আশ্রমে সে এসে উঠেছে তার কর্মচারীগুলোকে দেখে তার মনে হল যেন দীর্ঘদিনের কোনও রোগে তারা ভুগছে। ভরত বলে এক ছোকরা সেবাইত আশ্রমের বাগানের পরিচর্যা করে, সেদিন ভোরে কৃপা হঠাৎ খেয়াল করে একটা ছাতিম গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ভরত কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। কৃপা ছুটে গেল তার কাছে।

— "কিরে? তোর শরীর খারাপ?"

ভরত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। অনেকক্ষণ সেভাবে থাকার পর বলল, "হ্যাঁ?"

— "তোর কী শরীর খারাপ হয়েছে? ওভাবে পড়ে আছিস যে?"

ভরত কোনও উত্তর দিল না। সেইভাবেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল কৃপার মুখের দিকে। কৃপা দেখল ছেলেটার শ্বাস ফুলেছে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দম নিচ্ছে। কৃপা তাকে তড়িঘড়ি তুলে এনে অফিস ঘরে বসাল। অফিস ঘরটা বেশ বড়। ঢুকতেই দুটো ব্যাপার তাঁর চোখে পড়ল যা এখানে একেবারেই বেমানান। ঘরের একদিকে রাধা কৃষ্ণের দোল খেলার একটা বিশাল মিউরাল রয়েছে। গতবার যখন সে এসেছিল তখন মিউরালটা সবে তৈরি হয়েছিল। আজ সে দেখল গোটা মিউরালটার ওপরে ধুলোর চাবরা পড়ে গেছে, শুধু তাই না, প্রায় আট ফুট চওড়া মিউরালটার ওপর কোণাকোণি ভাবে একটা বিশাল ফাটল! ফাটলটা সবথেকে চওড়া শ্রীকৃষ্ণের মুখের ওপর!

গত তিনদিন ধরে পুরীতে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বছরের এইসময় সেটা অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যেও সূর্যের আলো ঢলে গেলেই কোথা থেকে যেন রাশি রাশি পোকা এসে ঘরে ঢোকে। আশ্রমের আশেপাশে

গাছপালা আছে ঠিকই। কিন্তু এমনটা তো সে কোনোদিন পুরীতে দেখেনি। উপকূলবর্তী এলাকায় নোনা বাতাসের কারণে এমনিতেই পোকামাকড়ের সংখ্যা কম হয়। তাহলে এত অস্বাভাবিক মাত্রায় পতঙ্গ এসে জুটছে কোথা থেকে? ঘরের আলো নিভিয়ে রাখা ছাড়া গতি নেই।

বৃষ্টিটা একটু ধরে যাওয়ায় কৃপা সন্ধের পর ঘরের আলো নিভিয়ে বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে বসল। কৃপার পাশের ঘরে সেই বাঙালি ভ্রমণ কাহিনীকার এসে উঠেছেন। উনি কোথা থেকে একগাছা নিমের কাঁচা ডাল জোগাড় করে তাতে আগুন ধরিয়েছেন। নিমের ধোঁওয়ায় পোকার থেকে কিছুটা রেহাই মিলল।

— "বাহ বেশ উপায় বের করেছেন তো।"

— "আর উপায়! এবার এখানে আসাটাই ভুল হল।" ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বললেন।

— "কেন? ভুল কেন বলছেন?"

— "দেখছেন না চারদিকে কি অবস্থা। যেখানেই যাই একটা বিকট পচা দুর্গন্ধ, স্টেশনে নেমেই পেয়েছিলাম গন্ধটা। এখানে এত কড়া সামুদ্রিক হাওয়া চলে তাও যেন ক্ষণেই ক্ষণেই গন্ধটা নাকে লাগে।"

— "গন্ধ?"

— "কেন আপনি পাননি? খুব বর্ষার ফলে নালা উপচে গেলে যেমন গন্ধ হয় তেমন। সবার যেন কি হয়েছে এবার। কোনও হোটেলের খাবারই মুখে রুচছে না। এসব ভেবে কাল শালিমার হোটেলে দুপুরে খেতে গেলাম। মাছটা দিল পচা, পেটের মধ্যে কিলবিল করছে পোকা! আমার গা ঘিনঘিনিয়ে উঠেছিল দেখে। ম্যানেজারকে ডেকে দিলুম ঝাড়, কিন্তু সবার মধ্যেই কেমন যেন একটা গা-ছাড়া ভাব। বেয়ারা থেকে মালিক সবাই যেন কলের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। কথা যেন কানে গেলেও মাথা অব্দি পৌঁছচ্ছে না। এমন কি এখানের পানীয় জলটাও কেমন নোনতা ঠেকছে। সে কলকাতার জলও নোনতা তবে এতটা নয়। কাল দেখলাম সরকারী হাসপাতালের বাইরে আউটডোরে রুগীর লাইন রাস্তা অব্দি চলে এসেছে। এত রুগী এল কোথা থেকে?"

কৃপা উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, "ভালো কথা, আপনার নামটা তখন জানা হয়নি।"

"প্রদ্যুম্ন মজুমদার।" উত্তর দিলেন ভ্রমণ কাহিনীকার ভদ্রলোক।

কৃপা নিজের নাম আগেই বলেছিল। ঘাড় নেড়ে শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। পুরীকে সে এই চেহারায় কখনো দেখেনি। কিছু একটা ঘটছে পুরো এলাকা জুড়ে। এমন কিছু যা শুভ নয়! বাতাসের দমকে লেগে থাকা গন্ধে, স্যাঁতস্যাঁতে সন্ধের অন্ধকারে, মানুষের ফ্যালফ্যালে চাহনিতে — সবকিছুতে সেই অশুভের আভাষ সে পেয়েছে। আজ ভোরে বৃষ্টি ধরে যাওয়ায় কৃপা বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বহুদূরে দক্ষিণের ঝাউবনের দিকে গিয়েছিল। একসাথে একটা গোটা ঝাউবন যে এইভাবে নেতিয়ে যেতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না! গাছগুলো সব যে শুকিয়ে গেছে তা নয় তবে গোড়ায় পচন ধরলে যেমন পাতা ঝরে শীর্ণ অবস্থা হয়, ঝাউগাছগুলোর বেশির ভাগেরই চেহারা তাইই।

কৃপা উঠে দাঁড়ালো। আজ তার রাতে খাওয়ার ইচ্ছে চলে গেছে।

— "একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন?" প্রদ্যুম্নবাবু বললেন।

— "কি?"

— "পুরীতে এসে থেকে একটাও কাক চড়ুই চোখে পড়েনি। আপনি দেখেছেন কিনা জানি না, আমি তো দেখিনি।"

কৃপা ঘাড় নাড়ল। ভদ্রলোক ভুল বলেননি। আজ রাতে কৃপার খাওয়ার ইচ্ছে চলে গেছিল। না খেলেও খাওয়ার আগে প্রার্থনায় সে অংশ নিল। খাবার ঘরের পাশে লম্বা প্রার্থনা-কক্ষ। আবাসিকরা প্রায় সকলেই এসেছেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ বৃদ্ধ স্বামী বৈকুণ্ঠপতি আজ প্রার্থনাপাঠ করাচ্ছেন। ঘরের আলোগুলো কেমন নিভু নিভু। কৃপা পেছনের সারিতে এসে দাঁড়ালো। তার পেছন পেছন প্রদ্যুম্নবাবু। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। প্রার্থনার প্রথম দু'লাইন শুনেই পেছন থেকে প্রদ্যুম্নবাবু ফিসফিস করে বললেন, "এ তো কোনও বৈদিক শ্লোক নয়! এরকম দুর্বোধ্য জড়ানো শব্দের মন্ত্র তো কখনো কোনও বৈষ্ণব প্রার্থনায় শুনিনি! এসব কি বলছেন বৈকুণ্ঠপতি?"

ঘরের ফাটল ধরা দেওয়ালে পোকা জমতে আরম্ভ করেছে। একটা মৃদু দুর্গন্ধ! সকলেই যেন কলের মানুষের মতো সেই দুর্বোধ্য প্রার্থনা আওড়ে যাচ্ছে। সকলেই যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে... এরকম মন্ত্র আদৌ কোনও হিন্দুশাস্ত্রে আছে কিনা তা কৃপার জানা নেই!

"বৈকুণ্ঠপতিকে এমন ঠেকছে কেন? যেন দীর্ঘদিন উপোষ করে রয়েছেন! দেওয়ালে ঝোলানো দেবদেবীর ছবিগুলির ওপর ভনভন্ করে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি! এসব কীসের অশনি সংকেত?" প্রদ্যুম্নবাবু চাপা গলায় বললেন। কৃপা তাকালো বৈকুণ্ঠপতির দিকে। খুব ভুল বলেননি প্রদ্যুম্নবাবু।

প্রার্থনা শেষ। বৈকুণ্ঠপতিকে ধরে ধরে মঞ্চ থেকে নামানো হচ্ছে। এগিয়ে গেল কৃপা আর প্রদ্যুম্নবাবু। প্যাসেজের শেষটা আধো অন্ধকার। সেখানে একটা জিরজিরে কেদারায় বসলেন বৈকুণ্ঠপতি।

— "স্বামীজী, যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জানতে চাই।" মার্জিত গলায় কৃপা প্রশ্ন করল।

বৈকুণ্ঠপতি মুখ তুলে তাকালেন। চোখ দুটো যেন দুটো অন্ধকার সুড়ঙ্গ... তাঁর শেষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

— "আজ আপনি যেই প্রার্থনা পাঠ করলেন, তা আমি কখনো শুনিনি। ভাষাটাও সংস্কৃত মনে হল না। দয়া করে যদি বলেন এ কোন শ্লোক ছিল... ?"

— "বোসো..."

বৈকুণ্ঠপতির গলার স্বর ঠান্ডা... ফ্যাসফ্যাসে...

কৃপা বসল তাঁর পায়ের কাছে। প্রদ্যুম্নবাবু দাঁড়ালেন একটু তফাতে। মেঝেটা যেন অসম্ভব রকম ঠান্ডা।

— "কার উদ্দেশ্যে করা হয় প্রার্থনা?"

কৃপা উত্তর দিতে সময় নিল না; "যে শোনে তাঁর উদ্দেশ্যে।"

হাসলেন বৈকুণ্ঠপতি। নীরব হাসি। তাঁর গা থেকে বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে! যেন ধুঁকছেন তিনি।

— "তুমি যাকে প্রার্থনা শোনাতে চাও, তার অস্তিত্ব নেই। আর যে শোনে, তাকে তুমি তোমার অতি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নেও শোনাতে চাইবে না।"

হঠাৎ যেন গোটা আশ্রম চত্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন এক ধাক্কায় থেমে গেল সমস্ত শব্দ। কৃপা তাকিয়ে রইল বৈকুণ্ঠপতির মুখের দিকে। একি সত্যিই তিনি? নাকি তাঁর ভেতর থেকে অন্য কোনও সত্ত্বা তাঁকে দেবভূমীতে দাঁড় করিয়ে এসব কথা বলাচ্ছে?

ঘরে ফিরে এল কৃপা। অনেকগুলি চিন্তা মাথায় খেলছে তার। মনে চাপা উত্তেজনা। খানিকক্ষণ পর শব্দ পেল পাশের প্রতিবেশী ঘরে ঢুকে দরজার হুড়কো দিলেন। ঘরে একটা মাত্র টিমটিমে ডুম জ্বলছে কৃপার। আশ্রমের বাহুল্যতা-বর্জিত ঘর। আসবাবপত্র সামান্যই। একটা চৌকি, একটা পুরনো আলনা, একটা তেপায়া টেবিল, একটা চেয়ার আর একটা জলের ঘড়া। ঘড়িতে প্রায় মাঝরাত। থমথমে হয়ে গেছে গোটা আশ্রম। কৃপা চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে চৌকিতে। চোখে একফোঁটা ঘুম নেই তার।

ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। কৃপা বিছানা ছেড়ে উঠে গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবিটা গলিয়ে সন্তর্পণে বেরোল ঘর থেকে। দরজাটায় তালা দিয়ে পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল। মূল ফটকের সামনে সাধারণত একজন দারোয়ান থাকে। আজ সে কাউকে দেখল না। এমনটাই সে আন্দাজ করেছিল। ধুতিটা শক্ত করে কোঁচা মেরে দেয়ালের গায়ের একটা পেয়ারা গাছ ধরে উঠে পড়ল। পাঁচিল বেশি উঁচু নয়। ওপর থেকে লাফ মেরে নিচে ভিজে রাস্তার ওপর এসে পড়ল।

শুনশান পথঘাট। বাম পাশের সড়কটা দিয়ে সোজা চলে গেলে মন্দির। কৃপা হাঁটতে আরম্ভ করল। রাস্তায় এত ল্যাম্পপোস্ট থাকাও সত্ত্বেও বেশিরভাগই জ্বলছে না। অবাক লাগল না কৃপার। মন্দিরের রাস্তায় এত জঙ্গল তো আগে দেখেনি সে। লতানে গাছ গজিয়ে পথের ধারে আগাছা প্রায় রাজপথের ওপর এসে পড়েছে। কিছু পুরনো বাড়ি ছিল। তাকিয়ে দেখল সেগুলোর ভগ্নপ্রায় অবস্থা। রাস্তার দু'ধারে বেশ কয়েকটা প্রাসাদ প্রমাণ বাড়ি অতিকায় দানবের কঙ্কালের মতো মেঘলা আকাশের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ ভেজা ঘাসের ওপর পায়ের আওয়াজ! কে ওখানে?

কৃপা ভালো করে তাকিয়ে দেখল একটা ছায়ামূর্তি বাম দিকের বাড়ির ফটকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। জঙ্গলে ঢাকা উঠোনের পেছনে তাঁকে ভালো চেনা না গেলেও কাছে আসতে কৃপা মুখটা দেখতে পেল।

— "একি আপনি?"

কৃপার সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রদ্যুম্ন মজুমদার।

— "ওহ! আপনিও বেরিয়েছেন?"

কৃপার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি, "ভেতরে কী করছিলেন?"

ভদ্রলোক গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "পুরীতে চারদিকে ছোট ছোট গুমটি মন্দির গজিয়েছে। অন্ধগলির শেষে, বনের কিনারে, পথ চলতি মানুষের চোখের আড়ালে গজিয়ে উঠেছে ছত্রাকের মতো।"

কৃপা খানিকক্ষণ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ধর্মীয় স্থানে মন্দির থাকবে এতে ক্ষতি কী?"

— "এ মন্দির সে মন্দির না মশাই। এর বিগ্রহ আপনি চিনতে পারবেন না। এর উপাচারের সাথে আপনি পরিচিত নন। এর প্রার্থনা আপনি বুঝতে পারবেন না। সবই যেন কেমন অদ্ভুত! উগ্র! অশুভ!"

দূরে কথাও মেঘের গর্জন শোনা গেল।

— "অশুভ?" কৃপার গলা ধরে এল।

— "আসুন, দেখে যান!"

ভদ্রলোক কৃপাকে নিয়ে দেয়ালের ফাটল দিয়ে ঢুকে গেলেন। বাড়ির ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভাঙা চাঙড়ে ধাক্কা খেল কৃপার পা।

"এদিকে!" — অন্ধকারের ভেতর শোনা গেল ভদ্রলকের গলা।

অট্টালিকাসুলভ বাড়িটার দালানের দু'দিকে লম্বা লম্বা থাম। তাদের ওপর উৎকল শিল্পকলার ঢঙ্গে বানানো এক জোড়া নৃসিংহ মূর্তি। অন্ধকারে তাদের বীভৎসতা যেন শতগুণে বেড়ে গেছে! হঠাৎ কৃপার কানে গোঙানির মতো একটা শব্দ এল।

দালানের অপর প্রান্তে দেখা গেল ভদ্রলোককে। হাতছানি দিয়ে ডাকছেন কৃপাকে। হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। ঠান্ডা কনকনে দক্ষিণের হাওয়া।

কৃপা এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক ইশারা করলেন সামনের দেওয়ালের ফাটলের দিকে। কৃপা নিচু হয়ে চোখ রাখল ফাটলে। দেয়ালের ওপাশে একটা বড়সড় হলঘর তবে পুরনো, চিড় খাওয়া। ঘরের দু কোণায় দুটো মশাল জ্বলছে। ধ্বকধ্বকে লাল আলোয় গনগন করছে শ্যাওলা ধরা দেয়ালগুলো। মেঝের মাঝামাঝি একটা মেটে-সিঁদুর ল্যাপটানো বিচিত্র মূর্তি, যা দেখতে মানুষের মতো হলেও কোনও হিন্দু দেবদেবীর সাথে কোনোরকম মিল নেই। এর আকৃতি কদাকার, যেন মানুষের অবয়বে ছাল ছাড়ানো এক দলা মাংসপিণ্ড! তফাত শুধু একটাই... মূর্তিটার তিনটে মাথা!

কৃপার নজর ঘরের সিলিঙের দিকে গেল। সেখান থেকে পাশাপাশি দুটো লোহার আংটায় ঝুলছে একজোড়া কৃষ্ণবর্ণ লোমশ পশুর মৃতদেহ। সম্ভবত শুয়োর। তাদের রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় এসে পড়ছে নিচের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে! অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে রয়েছে জনা দশেক নারী-পুরুষ। তাদের সকলেরই শরীরে ছিন্নবস্ত্র, চুল উস্কখুস্ক, মুখ-চোখ নোংরা আর ভাষাহীন! এবার কৃপা বুঝতে পারল এতক্ষণ যাকে গোঙানির শব্দ ভেবে সে ভুল করেছিল সেটা আসলে এদের সমবেত কণ্ঠে আওড়ে যাওয়া কোনও দুর্বোধ্য প্রার্থনা!

"কারা এরা? আর... কীসের আরাধনায় মেতেছে এমন বীভৎস উপাচারের মাধ্যমে?" কৃপার গলা কাঁপছে।

— "ইল্যুমিনাটি!"

— "কি?"

— "পিশাচ এর উপাসক!" গলার স্বর যতটা সম্ভব নামিয়ে উত্তর দিলেন প্রদ্যুম্নবাবু। ফাটলের ভেতর থেকে আলোর চিলতে এসে পড়েছে তার মুখে। কৃপা চোখের পলক ফেলা ভুলে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

"গোটা শহরে ছেয়ে গেছে এরা!" বলে চললেন প্রদ্যুম্নবাবু। "আমি তখনই বুঝেছিলাম। সবকিছুর এই নারকীয় পরিবর্তন কখনই কাকতালীয় হতে পারে না। অন্ধকারে উঁকি মেরে দেখুন, দেখতে পাবেন এদের চুপিসারে গতিবিধি, দেওয়ালে কান পাতুন, শুনতে পাবেন এদের ফিসফিসে অশুভ মন্ত্রোচ্চারণ!

গন্ধ নিন বাতাসের, গা গুলিয়ে উঠবে নরকের দুর্গন্ধে! চারিদিকে চলছে এসব, চব্বিশ ঘণ্টা, সর্বক্ষণ। গণ-হিস্টিরিয়ার মতো মানুষ এদের [illegible] হয়ে যাচ্ছে। কেন, কীভাবে আমি জানি না কিন্তু পাপে ছেয়ে গেছে পুরী! আমি জানি আপনি একজন সন্ন্যাসী হয়ে মনকে বার বার বোঝাবেন যে এই কথা সত্যি নয় কিন্তু অন্তরে আপনিও জানেন আমি মিথ্যে বলছি না।”

দূরে কোথাও গুমরে উঠল মেঘ। কৃপা ভদ্রলোককে উত্তর দেওয়ার মতো কিছু পেল না। দু'জনে ধীরে ধীরে পথে নেমে এল।

— “কোন্ সর্বনাশের পথে চলেছে পুরী? তিনদিন পর নবকলেবরের সমাপন! তলে তলে একটা গোটা শহর এরকম মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে রয়েছে! রোগটা শরীরের শুধু নয়, আত্মার...। কে করবে এর প্রতিকার? কীভাবে এই শাপমোচন হবে পুরীর?” কৃপা প্রায় কলের মানুষের মতো কথাগুলো বলে গেল।

— “আমি জানি না কাকে বললে সে আমাদের কথা বিশ্বাস করবে। ভেতরের কাউকে আমরাই বা ভরসা করি কীভাবে? আর বাইরের কাউকে বলার পর সে যদি কিছু খুঁজে না পায়, তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে!”

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের কাছাকাছি চলে এসেছিল। রথযাত্রার এত কাছাকাছি মন্দিরচত্বর এত জনমানবহীন কখনো থাকে কি?

মিশমিশে কালো আকাশের বুকে লাল-হলুদ ধ্বজা উড়ছে মন্দিরের চুড়ো থেকে। বাইরে রাস্তার ওপর সপসপে ভিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে রথের খাঁচা। কিন্তু একি অবস্থা! আর এক সপ্তাহও বাকি নেই, এখন তো রাত দিন জেগে কাজ হওয়ার কথা, এ কি অবস্থায় পড়ে রয়েছে রথ তিনটে! এরা আদৌ সময়ে কাজ শেষ করতে পারবে তো? নান্দিঘোষ, তালধ্বজ, বলভদ্র এবছর আদৌ রাজপথ ধরে ছুটবে তো? পড়বে তো তাদের রশিতে লাখ লাখ মানুষের টান?

“আমি এর আগেও রথের সময় পুরীতে এসেছি।” বললেন প্রদ্যুম্নবাবু। “এতদিনে রথের...”

চোখ ঝলসানো আলোয় অন্ধ হয়ে গেল দু'জনেই! সাথে কানের পরদা

চিড়ে দেওয়া শব্দ! কৃপা প্রদ্যুম্নবাবুর কথা শুনতে শুনতে পেছনে নির্মীয়মাণ রথের চাকাটায় সবে হেলান দিয়েছে হঠাৎ যেন প্রায় তাদেরই ওপর বিকট শব্দে বাজ পড়ল! দু'জনে ছিটকে পড়ল ভেজা রাস্তার ওপর।

সম্বিত ফিরতে কয়েক সেকেন্ড লাগল কৃপার... না জ্বলে যায়নি তারা। কিছুটা দূরে দেখল প্রদ্যুম্নবাবুও উঠে বসেছে রাস্তার ওপর। রথের গায়ে দাঁড়ানো একটা উঁচু বৈদ্যুতিক খুঁটির মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! বাজটা তাহলে তাদের ওপর পড়েনি। কানে তালা লেগে গেছে কৃপার। প্রদ্যুম্নবাবু টলতে টলতে সামনে এগিয়ে এলেন।

— "আপনি ঠিক আছেন?" কৃপা এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

উনি উত্তর দিলেন না।

— "কী দেখছেন অমন করে?" তাঁর নজর কৃপার পেছনে আকাশের দিকে...

ঝোড়ো হাওয়া দিতে শুরু করেছে। কৃপার মুখে চোখে ঠান্ডা বৃষ্টির ফোয়ারা এসে লাগল। পেছন ঘুরল কৃপা। নীলচে বিদ্যুতের আলোয় মিশকালো মেঘে ঢাকা আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দিরের চুড়ো। থমকে দাঁড়িয়ে গেল কৃপা; সেই চুড়ো খালি! না... তাতে পতিতপাবন রাজধ্বজা নেই! আতঙ্কে বিস্ময়ে আঁতকে উঠলেন প্রদ্যুম্নবাবু! পুরীর মন্দিরের মাস্তুল পতাকাশূন্য! এ কী করে সম্ভব! ঠিক কত জোরে হাওয়া দিলে সেই বিশাল মঙ্গলধ্বজ উড়ে যেতে পারে!

— "এ যে সর্বনাশের সংকেত মশাই! পুরীর মন্দিরের পতাকা উড়ে যাওয়া মানে সে তো মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাষ!" কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রদ্যুম্নবাবু।

দৌড়তে আরম্ভ করল দু'জন। হাওয়ার দমক মুহূর্তে মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচণ্ড হাওয়ার গতিবেগের বিরুদ্ধে এগোতে কষ্ট হচ্ছিল দু'জনের। কোনো রকমে মুখ-চোখ ঢেকে দৌড়তে দৌড়তে আশ্রমের ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ালো তারা।

একি! এত রাতে মূল ফটক খোলা! ভেতরে আলোই বা জ্বলছে কেন?

গেটের পাশের খুপরিটায় দারোয়ানটাকে দেখা গেল না। ভেতরে ঢুকেই উলটো মুখে আসা একজন সেবাইতকে ধরে কৃপা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, এত রাতে ফটক কেন খোলা, এত আলোই বা কেন জ্বলছে।"

ছেলেটির মধ্যে ঝিমঝিমে ভাব নেই, সম্ভবত সে পুরীর বাসিন্দা নয়, উড়িয়া মেশানো বাংলায় উত্তর দিল, "বৈকুণ্ঠপতি স্বামীর অবস্থা খুব খারাপ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হাসপাতালে খবর দেওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স আসছে।"

কৃপা আর প্রদ্যুম্নবাবু দুজনেই এক দৌড়ে তিনতলায় উঠে গেলেন। ঘরের সামনে এক বিচিত্র পরিস্থিতি। অনেকেই জড়ো হয়েছে তবে প্রায় সকলেই যেন কোনও অজানা সুরায় মাতাল। বেশিরভাগেরই চোখ ঢুলু ঢুলু, হাতে পায়ে তেমন জোর নেই। ঘরের ভেতর পালঙ্কে শুয়ে আছেন বৈকুণ্ঠপতি। চোখ বন্ধ, শ্বাস ফুলে গেছে। কৃপারা ঘরে ঢুকতে উনি চোখ মেলে চাইলেন। খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কৃপার দিকে। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। প্রদ্যুম্নবাবু কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন।

বৈকুণ্ঠপতি হাত তুলে ইশারায় কৃপাকে পাশে বসতে বললেন। কৃপা বসল। বৈকুণ্ঠপতি এবার ইশারা করলেন বাকি সকলকে বাইরে চলে যাওয়ার জন্য।

"আমি তাহলে বাইরে দাঁড়াচ্ছি।" বলে প্রদ্যুম্নবাবু হাঁটা লাগাচ্ছিলেন।

কৃপা হাত দেখাল, "আপনি থাকুন।"

ঘর খালি হলে বৈকুণ্ঠপতি চিঁচিঁ করে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন। কৃপা খানিকটা ঝুঁকে পড়ে ওনার মুখের কাছে কান নিয়ে গেল।

"বড় ভুল করেছি আমি... বড় ভুল।" কান্না জড়ানো গলায় বললেন বৈকুণ্ঠপতি।

"কী ভুল করেছেন স্বামীজী?" কৃপার চোখ কুঁচকে গেছে। প্রদ্যুম্নবাবু এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন বৈকুণ্ঠপতির শিয়রের কাছে।

শ্বাস একটু স্বাভাবিক হলে বৈকুণ্ঠপতি বলতে আরম্ভ করলেন, "এই প্রথম এত বছর পর নবকলেবর অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় বাইশ বছর..."

"চব্বিশ", পাশ থেকে প্রদ্যুম্নবাবু বলে উঠলেন। কৃপা ইশারায় থামিয়ে দিল তাঁকে।

— "এখনও মনে আছে, শেষ যেবার নবকলেবর হয়, দৈতাপতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে পতি মহাপাত্রর সাথে 'ব্রহ্ম পরিবর্তন' করতে যাওয়া নিয়ে। দেবতাকে নিয়ে যখন মানুষ ভাগাভাগি আরম্ভ করে নিজের দর বাড়ানোর জন্য তখন তার থেকে জন্ম নেয় পাপ! লক্ষ্মণ ভট্ট নামে জগন্নাথের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল। তখন কতই বা বয়স তার, বছর সতেরো হবে। তার বাবা মন্দিরের ভাঁড়ারে মহাপ্রসাদের দায়িত্বে ছিল। চিরকাল জগন্নাথ স্বামীর সেবা করে গেছেন। ছেলেও হয়েছিল তাই। খেলাধুলোর বয়স থেকে সে এসে মন্দিরে পড়ে থাকত। সন্ধ্যাবেলা ভাগবত পাঠ করত। কর্মগুণে সে পতি মহাপাত্রর সুনজরে এসে যায়। দৈতাপতিদের মধ্যে সে সহজেই নিজের জায়গা করে নেয়। সেবার প্রথম ব্রহ্ম পরিবর্তন-এ লক্ষ্মণ যাওয়ার সুযোগ পায় পতি মহাপাত্রর সাথে। তার খুশি বাঁধ ভেঙে যায়।

কিন্তু প্রভুর বোধহয় ইচ্ছে অন্যরকম ছিল। দারু-চয়ন শুরু হওয়ার আগে হঠাৎ দৈতাপতিদের মধ্যে লক্ষণের জন্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সে আদৌ দৈতাপতি পরিবারের কিনা, বা তার জন্ম আদৌ দৈতাপতি সংসারে হয়েছে কিনা এই নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তার বাবা দৈতাপতি হলেও মা ছিল চণ্ডাল! এ কথা এতদিন লুকিয়ে থাকলেও তখন হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে। প্রভুর কাছে মনের ভক্তিই সব কিন্তু মানুষের লালসা, ভক্তির ওপরেও জাতপাতকে নিজের লাভের জন্য বরাবর ব্যবহার করে থাকে। তার মায়ের গোপন সত্য বার হতেই এক ধাক্কায় সবাই লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে চলে গেল। সে এতদিন প্রভুর কাজ করে মন্দির অশুচি করেছে এমন কথাও বলতে লাগল সবাই। সে গিয়ে পতি মহাপাত্রর হাতে পায়ে ধরল তাকে প্রভুর এই কৃপা থেকে বঞ্চিত না করার জন্য। জগন্নাথ স্বামীর ব্রহ্ম পরিবর্তন! সে কি কম সম্মানের? কিন্তু তিনিও ছেলেটার পাশে দাঁড়ালেন না। ওনার মনে কি ছিল নারায়ণ জানেন কিন্তু সমগ্র মন্দির-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তাঁর হল না। লক্ষ্মণকে মন্দিরের কাজকর্ম থেকে চিরকালের মতো নির্বাসিত তো করাই হল, সাথে তার মরা বাপের এহেন 'নিষিদ্ধ প্রেম' নিয়েও লোকে অকথ্য টিপ্পনী করতে লাগল।

জলে চলে গেল তার সারা জীবনের ভক্তি আর পরিশ্রম। রাগে অপমানে

পুরী ছেড়ে চলে গেল লক্ষ্মণ। প্রাণ উজাড় করা আনুগত্য বদলে গেল বিষাক্ত ক্ষোভ আর অভিমানে! বিষিয়ে গেল লক্ষ্মণের মন! আর সেই বিষের রোষ গিয়ে পড়ল স্বয়ং জগন্নাথ স্বামীর ওপর। মন্দির তো সে ত্যাগ করলই সেই সাথে ত্যাগ করল তার ইষ্টদেবতার ওপর সমস্ত রকম বিশ্বাস। শ্রীভগবানের ওপর তার রাগ এতটাই প্রবল হয়ে উঠল যে সে মনে মনে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে লাগল নিজেকে। মনে মনে শপথ করল যেই পাপের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে প্রভুকে ঘিরে, সে নিজে হয়ে উঠবে সেই পাপের অধীশ্বর!"

বৈকুণ্ঠপতি থামলেন। একটু কাশলেন। পাশের টেবিলে রাখা জলের গেলাসটা এগিয়ে দিল কৃপা। দু'ঢোঁক খেয়ে তিনি আবার বলে চললেন,

"ভক্তের ভক্তিতে যখন গ্রহণ লাগে তখন আড়ালে বসে তৃপ্তির হাসি হাসে শয়তান! কারণ ভালোবাসা যতটা গভীর হয়, তার থেকে জন্ম নেওয়া জিঘাংসাও হয় ঠিক ততটাই ভয়ানক! লক্ষ্মণ আবারও আরাধনা শুরু করল। তবে এবার মহাপিশাচের! ধর্মীয় রীতি ভুলে মেতে উঠল উদ্দাম পিশাচতন্ত্রে! যেই গুটিকতক মানুষ তার পক্ষে ছিল, তাদের নিয়ে সে শুরু করল পিশাচসাধনা। তারপর এল সেই অভিশপ্ত রাত! যেই রাতে শেষ ব্রহ্ম পরিবর্তন হয় পুরীতে। সমুদ্রের ধারে শুরু হয় তাঁদের নিজেদের ডাকিনীবিদ্যায় লক্ষণের নিজের ব্রহ্ম পরিবর্তন! মহাপিশাচের যজ্ঞের ছাই নিজের বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে এই পুরীর সমুদ্রতটে সে নিজেকে পুঁতে ফেলে, এই আশায় যে তার আত্মা কয়েদ থাকবে ওই যজ্ঞের ছাইতে। আর তার অভিশাপে শ্রীক্ষেত্র পরিণত হবে পিশাচপুরীতে! এখানে কেউ দেবতার পূজো করবে না! কারোর জীবনে ঔজ্জ্বল্য থাকবে না! ব্যাধিতে গ্রাস করবে পুরীর প্রত্যেকটি মানুষকে। মানুষ ঐশ্বরিক আরাধনা ছেড়ে পৈশাচিক উপাচারে ব্রতী হবে! সেই রাতেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস টেনে নিয়ে যায় লক্ষণের সাথীদের। যে হাতে গোণা কয়েকজন বেঁচে ছিল, তারাই এই পাপের বীজ বপন করতে আরম্ভ করে পুরীর মানুষের মনে।"

থামলেন বৈকুণ্ঠপতি। তাঁর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ঘরে

পিন পড়া নিস্তব্ধতা। শুধু বাইরের ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রদ্যুম্নবাবু কাঠ হয়ে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কৃপা লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল, "এসব আপনি জানলেন কী করে?"

— "সেই রাতে জলোচ্ছ্বাসের পর যে ক'জন বেঁচেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন।"

হঠাৎ যেন ঘরের অক্সিজেন কমে গেছে। গলাটা শুকিয়ে এল প্রদ্যুম্নবাবুর! কৃপার মনে পড়ে গেল আজ সন্ধ্যার প্রার্থনার কথা...

"তবে আমি ভুল করেছিলাম বাছা। খুব ভুল। তোমায় ভুল বুঝিয়েছিলাম। তিনি আছেন। সর্বক্ষেত্রে আছেন। সবার মধ্যে আছেন। না হলে সেদিন আচমকা ওরকম জলোচ্ছ্বাস হত না। তিনি যেন বার বার আমায় বলছেন... আমি ভুল পথে চলেছি... তাঁর প্রতি অভিমান করে সৃষ্টির সর্বনাশ করতে চেয়েছি!... এই অনুতাপ! উফ! এই অনুতাপ..."

শ্বাস চড়ে গেল বৈকুণ্ঠপতির!

"প্রদ্যুম্নবাবু আপনি বাকিদের ডাকুন!" উঠে দাঁড়ালো কৃপা।

"না... না... বাকিদের সামনে আমি এ কথা বলতে পারব না গোঁসাই! আমার কথা মন দিয়ে শোনো। শহরের দক্ষিণদিকে ঝাউবনের ধারে সমুদ্রের পাড়ে কোথাও সেই ছাইয়ের পাত্রটি আজও পোঁতা রয়েছে! লক্ষণের আত্মার যতদিন শুদ্ধিকরণ না হবে ততদিন পুরীর শাপমোচন অসম্ভব। তোমরা সেই পাত্রটিকে খুঁজে তার থেকে... কে? কে ওখানে?"

হঠাৎ গলা চড়ে গেল বৈকুণ্ঠপতির!

— "কোথায় স্বামীজী? কেউ তো নেই?" কৃপা এদিক ওদিক দেখা বলল।

— "না! ঐ যে! দেয়ালের ধারে... অন্ধকারে ও কারা দাঁড়িয়ে আছে? তোরা কেন এসেছিস? আমি যাবো না তোদের সাথে! আমার রাধামাধব নিয়ে যাবে আমায়! কারা তোরা? ওরা কারা ওখানে?" হাহাকার করে উঠলেন বৈকুণ্ঠপতি! তাঁর মুখচোখ হঠাৎ কুঁকড়ে যেতে আরম্ভ করল! চোখদুটো বেঁকে গেল বীভৎসভাবে!

— "ডাকুন সবাইকে! জলদি! আর দেখুন অ্যাম্বুলেন্স কতদূর!" চেঁচিয়ে

উঠল কৃপা।

হঠাৎ মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠতে লাগল বৈকুণ্ঠপতির। ওনার হাত-পায়ে খিঁচুনি মারতে আরম্ভ হোল। যেন ভেতর থেকে কোনও অদৃশ্য শক্তি নিংড়ে নিচ্ছে ওনাকে। খাবি খেতে থাকলেন বৈকুণ্ঠপতি। সকলে ঘরে ঢুকতেই একবার ভয়ার্ত চোখে দক্ষিণের অন্ধকার দেয়ালের দিকে তাকালেন তারপর হঠাৎ নিথর হয়ে গেলেন!

কৃপা উঠে দাঁড়ালো বিছানার পাশে। তাঁর চোখদুটো দেখে ভালো লাগল না কৃপার। যেন ঠিকরে বেড়িয়ে আসছে। কৃপা আলতোভাবে বন্ধ করে দিল চোখ দুটো।

বাইরে অ্যাম্বুলেন্স-এর শব্দ পাওয়ামাত্র কৃপা আর প্রদ্যুম্নবাবু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অ্যাম্বুলেন্স ঢুকছে বটে মূল ফটক দিয়ে কিন্তু ওগুলো কি? এত বড় বড় গাড়ি কখন এল। আর রাস্তায় এত মানুষই বা কোথা থেকে এল? পুরী কি তাহলে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে?

দুজনে নেমে এল নিচে! উঠোনে বেরোতেই বুঝল বড় বড় গাড়িগুলো মিলিটারি জাওয়ানদের। রাস্তায় থিকথিক করছে সশস্ত্র বাহিনীর লোক।

"কী ব্যাপার অফিসার? এত জওয়ান হঠাৎ?" প্রদ্যুম্নবাবু এগিয়ে গিয়ে একজনকে ধরে জিজ্ঞেস করলেন।

"আবহাওয়া দপ্তর মাঝরাতে হঠাৎ সতর্কতা জারি করেছে! সাইক্লোন অ্যালার্ট! গোটা উড়িষ্যা উপকূলকে আজ রাতের মধ্যে খালি করা হচ্ছে। কাল দুপুরের সাইক্লোন আছড়ে পড়বে সমুদ্রতটে। সেই সাথে সুনামিরও সম্ভাবনা রয়েছে!"

বুক কেঁপে উঠল প্রদ্যুম্নর! "কাল ব্রহ্ম পরিবর্তন! সেই একই দিনে আবার জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাষ! সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি!" দাঁত চেপে কথাগুলো বলে গেল কৃপা।

— "কীরকম গতিবেগ হতে পারে ঝড়ের?" প্রদ্যুম্নবাবু শুধোলেন।

— "দু'শোর আশেপাশে। এবার নাম দিয়েছে শ্রীলঙ্কা— 'লুসি'।"

দু'পা পেছনে সরে এল কৃপা। প্রদ্যুম্নবাবু অন্ধকার মুখ করে ফিরে তাকালেন

তার দিকে। মন্দিরের চুড়োটা এখান থেকে দেখা যায় না। তবে কৃপা জানে পুরীর মন্দিরে ধ্বজাশূন্য হওয়া ঘোর অশনি সঙ্কেত!

ভোরের আলো ফোটার পর বৈকুণ্ঠপতিকে দাহ করা হোল স্বর্গদ্বারে। মাঝখানে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম পেয়েছিল কৃপা আর প্রদ্যুম্নবাবু। বৃষ্টি থেমে গেলেও সমুদ্রের ওপরের আকাশ মিশমিশে কালো হয়ে রয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ যতদূর চোখ যায়, মেঘের চাদর অন্তহীন চাঁদোয়ার মতো ঝুলে রয়েছে সমুদ্রের ওপরে। চিতার আগুনের ভেতর দিয়ে কৃপা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। ছোবল মারার আগে সর্পিণী যেমন ফোঁসে সমদ্র যেন তেমনভাবেই ফুলে ফুলে উঠছে। তাঁর রং এখন আর নীল নেই। মেঘের প্রতিফলনে সাগর ধূসর কালো রঙের দানবের মতো গর্জন করে চলেছে! পর্যটক যা ছিল পুরীতে সকলে হুড়োহুড়ি করে রাজপথ দিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরেছে। সেনাবাহিনী টহল দিয়ে চলেছে রাস্তায়। সমুদ্রতটের সমস্ত হোটেল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

— "আপনি ফিরে যাবেন না?" প্রদ্যুম্নবাবু চিতার সামনে দাঁড়িয়ে কৃপাকে প্রশ্ন করলেন।

কৃপা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, "স্বামীজী যা বলেছেন তা আমি আর আপনি ছাড়া কেউ জানে না। আপনাকে আমি আটকে রাখতে পারবো না। সেটা উচিৎও নয়। কিন্তু আমি সংসারত্যাগি সন্ন্যাসী। আমার মৃত্যুভয় নেই। সেই পাপের ঘড়া আমি খুঁজে বের করবই। নাহলে শ্রীক্ষেত্রের শাপমোচন অসম্ভব!"

প্রদ্যুম্নবাবু মাথা নিচু করলেন। তারপর বললেন, "আর উনি যা যা বললেন তা যদি মৃত্যুপথযাত্রীর নিছক প্রলাপ হয়?"

— "তাহলে তো চুকেই গেল। কিন্তু পুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অভিশাপ রোগের মতো ছড়িয়েছে তা থেকে মুক্তি দেওয়ার এই পুণ্যের সুযোগ আমি ছাড়তে চাই না।"

প্রদ্যুম্নবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ। আমারও সংসার নেই। বাড়িতে লোক বলতে একজন চাকর, একজন রাঁধুনি। একান্তই যদি প্রাণে না বাঁচি,

হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসার মতো কেউ নেই।"

"তাহলে থেকে যাবেন বলছেন?" কৃপার ঠোঁটের কোণে হাসির ঝলক।

প্রদ্যুম্নবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "পুড়তে যখন হবেই তখন নিমতলার থেকে স্বর্গদ্বারে পোড়া অনেক ভালো।" বলে নিজেই এই বেমানান জায়গায় মুখ টিপে হাসলেন।

দু'জনে যখন আশ্রমে ফিরে এল তখন ঝোড়ো হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। আশ্রমে ঢুকতেই দু'জনে বুঝতে পারল আশ্রম খাঁ খাঁ ফাঁকা। সকলে কি তাহলে পালিয়েছে? সঙ্গে যে কয়েকজন দাহ করে ফিরল তারাও যে যার মতো মালপত্তর গুছিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানত্যাগ করল। সনাতন নামে একজন উড়িয়া কেয়ারটেকার ছিল। কৃপা নিচে নেমে দেখল সে অফিসঘরে বসে ঢুলছে।

— "সকলে কি চলে যাচ্ছে?"

সনাতন জড়িয়ে জড়িয়ে যা বলল তাতে বোঝা যায়, পুলিশ সকল পর্যটককে পুরী ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাই এরাও আর কাউকে থাকার অনুমতি দেবে না।

— "এই দুর্যোগে মাথা গুঁজবেন কোথায়?" প্রদ্যুম্নবাবু নিজের ছোট ব্যাগটা কাঁধে চাপিয়ে গায়ে রেনকোটটা পরতে পরতে বললেন।

— "একটাই জায়গা আছে যেখানে যত দুর্যোগই হোক, প্রাণহানি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।" কৃপা উত্তর দিল।

— "কোথায়?"

— "মন্দির।"

হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। রাস্তায় বেরোতেই কৃপার হাতের ছাতা এক ঝটকায় উড়ে বেড়িয়ে গেল। পাশের বন্ধ দোকানের শাটারের বাইরে উড়তে থাকা একটা বড়সড় প্লাস্টিক কৃপা জড়িয়ে নিল গায়ে। দু'জনে হাঁটতে লাগল খাঁ খাঁ রাজপথ ধরে। বৃষ্টির এক-একটা ফোঁটা যেন তীরের মতো বিঁধতে লাগল তাদের মুখে। আবহাওয়া দেখে সময়ের ঠাওর না হলেও কৃপা জানে এখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। পুরী শহরকে জনমানবশূন্য করে দিয়েছে

প্রশাসন। যেদিকে চোখ যায়, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া বৃষ্টিতে একলা দাঁড়িয়ে ভিজছে এক নিঝুম নিষ্প্রাণ অভিশপ্ত শহর!

মন্দিরের সামনে ঝড়ের ঝাপটায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে তিনটে অসমাপ্ত রথ। তাদের বিশাল চাকাগুলো থেকে থেকে এমনভাবে থরথরিয়ে উঠছে যেন এখুনি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বৃষ্টিভেজা রাজপথে। কৃপা আর প্রদ্যুম্নবাবু দাঁড়ালেন না। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে তুললেন কয়েকশ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে। মন্দিরের চাতালের পাশে সার দিয়ে পাথরের ছোট ছোট খুপরি। এগুলো আসলে সবই কোনও না কোনও দেবদেবীর পূজার বেদি। একে কাল প্রায় সারারাত জাগা, তারপর আজ ভোর থেকে প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি। ক্লান্ত শরীরে দু'জনেই এলিয়ে পড়ল একটা পাথরের ছাউনির নিচে।

কতক্ষণ সেভাবে পড়েছিল খেয়াল নেই কৃপার। তন্দ্রা কাটল প্রচণ্ড এক শব্দে। উঠে বসল কৃপা। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার চারদিকে। মনে পড়তে কয়েক মুহূর্ত লাগল যে সে কোথায়। তাকিয়ে দেখে পাশে প্রদ্যুম্নবাবু নেই! তাঁর মালপত্র সমস্ত পড়ে রয়েছে পাশে। কিন্তু উনি কই? হঠাৎ কৃপার নজর গেল বাইরে। বিদ্যুৎ চমকেছে! তার আলোয় কৃপা এই প্রথম পুরীর মন্দিরকে এই চেহারায় দেখল!

তুফান বয়ে যাচ্ছে ছাউনির বাইরে! মন্দিরের চাতাল থেকে ধোঁওয়া উঠছে বৃষ্টির ফোঁটার জোরে। আকাশ ছুঁয়ে অন্ধকারে কোনও অতিকায় দানবের মতো দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের চূড়া! তার ধ্বজাহীন মাথা হারিয়ে গেছে মেঘের ভেতরে! তার গায়ের মূর্তিগুলো দিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে সহস্র ঝর্ণা। যেন এক পর্বতপ্রমাণ শিবলিঙ্গের মাথায় তাঁর সমস্ত তেজ নিয়ে গঙ্গা আছড়ে পড়ছে!

কোথায় গেলেন প্রদ্যুম্নবাবু? কৃপা ঘুরল মন্দিরের দিকে। সে কি ঠিক শুনল? ঘণ্টাধ্বনি! কোথা থেকে আসছে এই শব্দ!

কৃপা আঁকড়ে ধরল মন্দিরের গায়ের একটা শেকলবাঁধা রেলিং! হাওয়ার ঝাপটায় যেন প্রায় উড়িয়ে দেয় তাকে! কৃপা শেকল ধরে ধরে গিয়ে পৌঁছল মূল গর্ভগৃহের বাইরে। ওই তো প্রদ্যুম্নবাবু। একা! অন্ধকার গর্ভগৃহের বাইরের

ছাউনির নিচে কেমন ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে রয়েছেন ভেতরের দিকে। আর এক মনে মাথার ওপরের ঝুলতে থাকা দড়িটা ধরে টান মেরে যাচ্ছেন।

ঢং ঢং ঢং! সেই অপার্থিব প্রলঙ্কর পরিবেশে যেন এক ঘোর লাগা মাদকতা সৃষ্টি করছে সেই ঘণ্টাধ্বনি!

মূল গর্ভগৃহের সিংহদুয়ার বন্ধ। সেই বিরাটাকার দরজার পেছনে পুরনো এবং নতুন মূর্তিকে মুখোমুখি বসানো হয়েছে। বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনজন। মাঝখানের জন নিশ্চয়ই পতি মহাপাত্র। সাথে দু'জন কম বয়সী দৈতাপতি। এরা মন্দির ছেড়ে নড়েনি। সম্ভবত এই বিশাল মন্দির চত্ত্বরে তাঁরা ছাড়া আর কেউ নেই।

— "জগন্নাথদেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সে যে নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। জান চলে গেলেও না।" কেমন সম্মোহিত স্বরে কথাগুলো বলে গেলেন প্রদ্যুম্নবাবু। তাঁর হাত একনাগাড়ে টেনে চলেছে ঘণ্টার রশি।

ঢং ঢং ঢং!

গুটি কয়েক প্রদীপ জ্বলছে সিংহদুয়ারের বাইরে। পাথরের দেওয়াল ভেদ করে ঝোড়ো হাওয়া ছুঁতে পারেনি তাদের শিখা। গোটা শহরের বিজলী বন্ধ করে দেওয়ায় সারা মন্দিরে ওই কয়েকটা প্রদীপই আলোর উৎস। যেখানে কৃপা আর প্রদ্যুম্নবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের আর ওই তিনজন দৈতাপতির মধ্যে আরেকটা দরজা। আর দৈতাপতিদের সামনে মূল গর্ভগৃহের সিংহদুয়ার।

"এ যে কত জন্ম পুণ্যের ফল... প্রভুর প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর মন্দিরে স্থান পাওয়া..." বলে উঠলেন প্রদ্যুম্নবাবু, "দেখুন, দেখুন কি ভয়াল ধ্বংসলীলা চলছে চারিদিকে, তার মধ্যে ওনার দুয়ারে শুধু আমরা স্থান পেলাম। আর কেউ নেই! কেউ না!" অন্ধকার পাথরের ঘরে প্রদ্যুম্নবাবুর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল।

তিনজন দৈতাপতি বেঁধে ফেললেন তাঁদের চোখ। শুরু হল মন্ত্রোচ্চারণ! ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। হঠাৎ থেমে গেল ঘণ্টাধ্বনি।

"ও-ওরা কারা?"

প্রদ্যুম্নবাবুর কম্পমান গলার স্বর কানে জেতেই কৃপা ফিরল সেদিকে

যেদিকে প্রদ্যুম্নবাবু হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। বৃষ্টির পর্দায় মধ্যে দিয়ে মন্দিরের চাতাল দেখা যাচ্ছে। বিশাল চাতালের ওপর বিদ্যুৎ ঝলকের আলোয় কৃপা দেখল সেখানে এক এক করে জড়ো হচ্ছে অনেকগুলো মানুষের আবয়ব। সকলের গায়ে কালো জোব্বা। কারা এরা? এই দুর্যোগের মধ্যে জনপ্রাণীহীন শহরে কোথা থেকে এল এরা।

পতি মহাপাত্রর কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ তাঁর কানে যেতেই সেদিকে ঘুরলেন প্রদ্যুম্নবাবু। এ কেমন মন্ত্র! উঁচু সরু গলায় গোঙানির মতো দুর্বোধ্যে ভাষার প্রার্থনা! তাঁর শিরা উপশিরা দিয়ে ঠান্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল! হুবহু এই মন্ত্র উনি শুনেছিলেন সেই পোড়োবাড়ির ভেতরে! এই শয়তানী চক্রান্ত এসে ঢুকেছে স্বয়ং জগন্নাথ স্বামীর দুয়ারে! পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতও এর স্বীকার! ব্রহ্ম পরিবর্তন যে সবথেকে পবিত্র উপাচার! প্রভুর প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে কলুষিত করার জন্যই কি এই বিরাট প্রেতসাধনা! লক্ষণ ভট্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল খোদ প্রভুর বিরুদ্ধে! প্রভুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা বিষিয়ে দিলে পাপ ছড়িয়ে পড়বে পুরীর আকাশ বাতাশে। শত শত বছর ধরে পবিত্রতার শিখর এই মন্দির অপবিত্রতার গর্ভ হয়ে যাবে! নরকে পরিণত হবে কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের এই স্বর্গ!

এগিয়ে আসছে অন্ধকারে ঢাকা মানুষগুলো। ক্ষণে ক্ষণে যেন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে! কোন গর্তে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল ওরা? প্রদ্যুম্নবাবু পিছোতে লাগলেন। হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে তাঁর। অপর দুই দৈতাপতি এতক্ষণে যেন বুঝতে পেরেছে কিছু একটা। তারা টেনে চোখে বাঁধন খুলতে যেতেই হঠাৎ পাথরের থামগুলো কাঁপিয়ে মাঝখানের প্রকাণ্ড দরজাটা বিকট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাস! যেইটুকু প্রদীপের আলো ভেতর থেকে আসছিল সেইটুকু আটকে গিয়ে মিশমিশে কালো হয়ে গেল চারিদিক।

প্রদ্যুম্নবাবু পেছোতে পেছোতে পেছনের দরজায় পিঠ থেকে গেল তাঁর। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল এই অন্ধকারে কৃপা তাঁর পাশে নেই! এই নরপিশাচগুলোর মাঝে তিনি সম্পূর্ণ একা! এবার শুধু মন্দিরের বারান্দায় প্রদ্যুম্নবাবু আর তাঁকে ঘিরে চাতালজুড়ে এগিয়ে আসা এই অমানুষগুলি!

'কৃপাসিন্ধু!' ভেঙে যাওয়া গলায় যত জোরে পারেন চিৎকার করলেন। কিন্তু মেঘের গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল তাঁর দুর্বল কণ্ঠস্বর!

বৃষ্টির ছাঁট-এ ভিজে যাওয়া ঠান্ডা পেতলের আংটাটা ঘাড়ে ঠেকল তাঁর। ভেজা শরীরটা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। আর থাকতে না পেরে পেছন ঘুরে দরাম দরাম করে আঘাত করলেন বন্ধ দরজায়। পেতলের পাত দিয়ে ঢাকা বিরাট দরজাগুলো সামান্য নড়ল পর্যন্ত না। সামনের ওগুলো কি জীবিত মানুষ? নাকি মানুষের শরীরে ভর করে থাকা শয়তান! তাদের শরীরগুলো যেন জমাট-বাঁধা অন্ধকারে গড়া। এই প্রচণ্ড তুফানেও তাদের শরীর এতটুকু এদিক ওদিক হচ্ছে না। নরপিশাচগুলো প্রায় মন্দিরের বারান্দায় উঠে এসেছে। প্রদ্যুম্নবাবু দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে নারায়ণকে ডাকতে লাগলেন।

হঠাৎ যেন পেছনের দরজাটা একটু নড়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পর তার বিশাল কয়রা দুটো ঝন ঝন করে দুলে উঠল। প্রদ্যুম্নবাবু ছিটকে সরে এলেন দু হাত! তারপর যেন এক প্রচণ্ড অদৃশ্য দমকা কান ফাটানো আওয়াজ করে অত বড় দুটো পাল্লা হাট করে খুলে গেল। আর ভেতরে যা দেখলেন তাতে প্রদ্যুম্নবাবুর হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। মেঝেতে পড়ে চিৎকার করছে দু'জন কনিষ্ঠ দৈতাপতি। পেছনের মূল গর্ভগৃহের দরজা খুলে গেছে। আর ভেতরে মিশকালো অন্ধারের মধ্যে থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে জ্বলন্ত এক মানব মশাল!

"পতি মহাপাত্র!" প্রদ্যুম্নবাবুর গলা দিয়ে শব্দ দুটো বেড়িয়ে এল! দাউ দাউ করে মাথা থেকে পা অব্দি জ্বলছেন পতি মহাপাত্র! তাই দেখে আতঙ্কে প্রায় আধমরা বাকি দুই দৈতাপতি। গেরুয়া বসনের সাথে গায়ের মাংস ছাই হয়ে গলে পড়ছে পাথরের মেঝের ওপর। জ্বলন্তমূর্তিটা দিশাহীনভাবে এদিক ওদিক উদভ্রান্তের মতো বাঁচার আশায় দৌড়োতে লাগল।

বাজের শব্দে যেন কানে তালা লেগে গেল প্রদ্যুম্নবাবুর! সেই লেলিহান শিখার আলোয় ঝলমল করে উঠল মন্দিরের চাতাল! যেন পাপের আঁধার মুছে ঐশ্বরিক প্রকাশ ধুয়ে দিল রাতের নরক-উপাশকদের। চাতাল জুড়ে

এগিয়ে আসা মানুষগুলো থমকে দাঁড়িয়ে গেল! তাদের ভাষাহীন চোখে তারায় ঝলমল করছে পতি মহাপাত্রর জ্বলন্ত দেহটা। পতি মহাপাত্র দৌড়ে এসে মন্দিরের বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রায় কুড়ি ফুট নিচে মন্দিরে চাতালের ওপর আছড়ে পড়লেন! হকচকিয়ে পেছনে সরে গেল নরপিশাচের দল! মুখের মাংস গলে যাওয়া প্রায় কঙ্কালে পরিণত হয়ে যাওয়া জ্বলন্ত শরীরটা শেষ বারের মতো একবার উঠতে চেষ্টা করল। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে একে একে পিছু হটতে লাগল নরপিশাচের দল!

— "প্রদ্যুম্নবাবু!"

হঠাৎ শোনা গেল কৃপার গলা। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন প্রদ্যুম্নবাবু। কৃপা পেছনের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে প্রদ্যুম্নবাবুর হাত চেপে ধরে ঘরের ভেতরে পড়ে থাকা দুই দৈতাপতির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, "উপাচার থামাবেন না! ব্রহ্ম পরিবর্তন করতে থাকুন! সময় চলে যাচ্ছে!"

তাঁরা উড়িয়া হলেও বাংলা বুঝবেন। কৃপা প্রদ্যুম্নবাবুর কব্জিতে হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, "চলে আসুন, এটাই সময়! এটাই সুযোগ!"

বশ হয়ে থাকা মানুষগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেই তাদের মধ্যে দিয়ে ছুটতে শুরু করল দু'জনে। প্রদ্যুম্নবাবুর একে বয়স হয়েছে তারপর কাল থেকে শরীরের ওপর অমানুষিক ধকল গেছে। উনি হাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। এবার তারা রাজপথ না ধরে মন্দিরের পেছনের অলিগলি দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ঝাউবনের ভেতরে এসে পড়ল। গোটা শহর ধূধূ ফাঁকা। রাতের বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে নিঝুম পুরী যেন নরকপুরীর রূপ ধারণ করেছে।

ঝাউবনের ভেতরে ঢুকে পড়েই প্রদ্যুম্নবাবু বসে পড়লেন বুক আঁকড়ে! হাঁপাতে লাগলেন হাপরের মতো।

— "এখানেই... এখানেই... শহরের দক্ষিণের ঝাউবনের সামনে... কিন্তু কোথায়? কোথায়?" কৃপা বিড়বিড় করতে করতে চারিদিকে খুঁজতে লাগল... "সময় নেই... একটুও সময় নেই।"

বালির ওপর পড়ে হাঁপাচ্ছেন প্রদ্যুম্নবাবু। চোখে এখনও ভাসছে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা পতি মহাপাত্রর ছবি। 'চৈতন্যচরিত'-এ একবার পড়েছিলেন

ভক্তি ছাড়া পুরীর মন্দিরের চৌকাঠ পেরোনো মহাপাপ! আজ যা হয়েছে, কীভাবে হয়েছে তা তিনি জানেন না, শুধু এটুকু জানেন যে তাঁর নারায়ণ মিথ্যে নয়। মন্দিরের পবিত্রতা মিথ্যে নয়।

— "হাতে সময় নেই প্রদ্যুম্নবাবু। যা করতে হবে এখুনি। মন্দিরে ব্রহ্ম পরিবর্তন চলছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণ যদি আমরা হারিয়ে ফেলি..."

হাঁপাতে হাঁপাতে এদিক ওদিক দেখতে লাগল কৃপা।

প্রদ্যুম্নবাবু কোনরকমে আশেপাশের গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে উঠে এসে দাঁড়ালেন বালির ওপর। ঝড় থেমে গেলেও বৃষ্টি থামেনি। ভিজে বালিতে পা টেনে ধরছে। এত বিশাল প্রান্তরে কোথায় খুঁজবেন লক্ষ্মণ ভট্টর কবর? তখনই হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দক্ষিণা বাতাসের ঝাপটা মুখে লাগতেই প্রদ্যুম্নবাবু দেখলেন সমুদ্রের ঢেউ পাড় থেকে অনেকটা দূরে ভেঙে সেখানেই শুকিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র যেন এক ধাক্কায় হঠাৎ অনেকটা পিছিয়ে গেছে। জলের তলায় থাকা বালিয়াড়ির অনেকটা অংশ বেড়িয়ে পড়েছে। কিছু ভাঙা বোল্ডার, জলে ডুবে থাকার ফলে প্রায় পচে যাওয়া ঝাউগাছের ডাল...

হঠাৎ চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ চমকাল। গোটা বালিয়াড়ি কয়েক মুহূর্তের জন্য দিনের আলোর মতো ফ্যাকাসে হয়ে পরক্ষণেই আবার অন্ধকারে ডুবে গেল। প্রদ্যুম্নবাবু কি ঠিক দেখলেন? জল সরে গিয়ে ভেজা বালির ওপর জেগে থাকা গাছের ডালের ওপর লম্বা উজ্জ্বল হলুদ রঙের ওটা কি?

'এই যে! এদিকে...' প্রদ্যুম্নবাবু ডাকলেন কৃপাকে।

দু'জনে এগিয়ে গেল সেদিকে। প্রদ্যুম্নবাবু বুঝলেন উজ্জ্বল হলদে রঙের বস্তুটা একটা কাপড়ের টুকরো। টেনে সেটা ডালের থেকে ছাড়াতেই কাপড়ের বাকি অংশটা বালির তলা থেকে উপড়ে বেড়িয়ে এল। প্রদ্যুম্নবাবুর হাত কাঁপতে লাগল। সারা শরীরে খেলে গেল বৈদ্যুতিক শিহরণ। প্রায় কুড়ি হাত লম্বা ত্রিভুজাকার কাপড়টার মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে টকটকে লাল চন্দ্রবিন্দুর নিশান!

মন্দিরের উড়ে যাওয়া পতিতপাবন ধ্বজা!

রাতের অন্ধকারে এই ধ্বজা ঠিক তাঁদেরই হাতে ধরা দিল! তাও সাগর

সরে গিয়ে!

— "এখানেই হবে।" প্রদ্যুম্নবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "চলুন খুঁড়ি।"

দু'জনে দুটো শক্ত ছুঁচলো ডাল জোগাড় করে ভিজে বালি খুঁড়তে লাগল। এক ফুট, দু ফুট, তিন ফুট... এক সময় জল উঠে এল বালির ভেতর দিয়ে... তারপর হঠাৎ যেন কিছু একটা ভাঙার শব্দ! দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কৃপা হাত ঢোকাল ভেতরে। বালি সরাতেই তলা থেকে বেড়িয়ে এল ভাঙা পাঁজরের টুকরো! বালি আরেকটু সরাতেই দেখা গেল তালগোল পাকানো একটা নরকংকালের হাতের হাড়গুলো পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে কালো হয়ে সামুদ্রিক আগাছা জন্মে যাওয়া একটা কালো পাথরের ঢাকনা দেওয়া পাত্রকে!

কৃপা টেনে বের করে আনল পাত্রটাকে। তারপর গায়ের জোরে একটা হ্যাঁচকা টান মারতেই ঢাকনাটা উপড়ে চলে আসল। ভেতরে কি আছে তা অন্ধকারে বোঝা না গেলেও পাত্রটির ওজন বলে দিচ্ছিল যে সেটি খালি নয়। কৃপা পাত্রটাকে দু হাতে তুলে ধরল। তারপর পায়ের কাছে যেখানে ঢেউ ভাঙা জল এসে বালিতে মিশে যাচ্ছে, সেখানে উপুড় করে দিল। ভেতর থেকে ধুলোর মতো অনেকটা পরিমাণ কালচে গুঁড়ো হাওয়ায় মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রদ্যুম্নবাবুর হঠাৎ যেন মনে হল পায়ের তলার বালি সরে যাচ্ছে। যেন পুরো প্রান্তরের বালি কেউ টেনে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। প্রদ্যুম্নবাবু তাকালেন কৃপার দিকে। কৃপার মাথার পেছনে প্রায় বিশ হাত উঁচু হয়ে কালো পাহাড়ের মতো উত্তাল জলরাশি ছুটে আসছে তাঁদের দিকে।

কৃপার হাতের পাত্রটা পড়ে গেল বালির ওপর। কৃপা কিছু বুঝে ওঠার আগেই পর্বতপ্রমাণ উঁচু ঢেউটা আছড়ে পড়ল তাদের ওপর। প্রদ্যুম্নবাবু প্রায় উড়ে গিয়ে ছিটকে ঢুকে গেলেন ঝাউবনের ভেতরে। জলের তোড়ে চোখের সামনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলো পাটকাঠির মতো ভেঙে ভেঙে আছড়ে পড়তে লাগল জলের ওপর। প্রদ্যুম্নবাবু কোনরকমে আঁকড়ে ধরলেন একটা ঝাউগাছের গুঁড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই জলে ভেসে আশা একটা মোটা ডাল

সপাটে এসে বাড়ি মারল তাঁর পাঁজরে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল তাঁর।

নির্জন বালিয়াড়ির ভেতর জলের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল লক্ষ্মণ ভট্টর নশ্বর অবশেষ। তারই সাথে সাগরের জলে ধুয়ে গেল মহাপিশাচের যজ্ঞের ছাই...

শুধু মাইলখানেক দূরে পতি মহাপাত্রর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ধোঁওয়া ওঠা দেহটার পেছনে, পুণ্যভূমির গর্ভগৃহে, প্রথমবার জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল দু'জন তরুন দৈতাপতির প্রাণ ভরা শ্রদ্ধা আর বুক ভরা ভক্তির বলে... কোনও 'পদাধিকার' বলে নয়।

* * * * * * * * * *

রথের দিন ভোরে প্রদ্যুম্নবাবুর জ্ঞান ফিরেছিল সেনা ছাউনির হাসপাতালে। ঝড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া পুরী তার নিটোল ভক্তি আর অটুট মনোবলের জোরে শেষ পর্যন্ত আয়োজন করতে পেরেছিল রথযাত্রার। লোক সমাগম প্রত্যেক বছরের মতো না হলেও উপাচারে সাধনের প্রাচুর্য ছাড়া আর কোনও কিছুরই কমতি ছিল না। প্রদ্যুম্নবাবুর পাঁজরার হাড়ে চিড় ধরেনি তবে আঘাতের আকস্মিকতা আর শারীরিক ক্লান্তির ফলে তাঁর শরীর ধকল সইয়ে উঠতে কিছুটা সময় নিয়েছিল।

কিন্তু কৃপা কই? জ্ঞান ফিরতেই তাঁর মনে পড়ল জলোচ্ছ্বাস হওয়ার আগে শেষ মুহূর্তে তিনি কৃপাকে ছাইয়ের পাত্রটা হাতে নিতে দেখেছিলেন। তারপর ঢেউয়ের ঝাপটায় তিনি জলের তলায় চলে গিয়েছিলেন। তারপর সব অন্ধকার! ছেলেটা বাঁচল তো? আহা, এইটুকু বয়সে পরিবার পরিজন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে সে...

বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে পা রেখেই প্রদ্যুম্নবাবু যেটা প্রথম উপলব্ধি করলেন তা হল বাতাসে নাক জ্বলে যাওয়া পচা গন্ধটা আজ একেবারেই নেই। একজন স্থানীয় মানুষের বাইক চেপে

ইসকনের আশ্রমের সামনে এসে নামলেন প্রদ্যুম্নবাবু। এ কি অবস্থা হয়েছে আশ্রমের! বাগান তছনছ হয়ে গেছে। পাঁচিলের ধারের নিমগাছটা উপড়ে পড়ে পাঁচিলের অনেকটা ধ্বসিয়ে দিয়েছে!

অফিসঘরে আজ সনাতন ছেলেটিই রয়েছে। কিন্তু আজ তার মধ্যে যেন এক স্পষ্ট পরিবর্তন চোখে পড়ে। হাতে একটা ডাস্টার নিয়ে সে দেয়ালের ভাঙা মিউরালের ধুলো পরিষ্কার করছে। সেই ঝিমঝিমে ভাবটা একেবারেই উধাও। প্রদ্যুম্নবাবুর চোখে তা এড়ালো না।

"কৃপাসিন্ধু বলে একজন তরুণ স্বামীজী এসে এখানে ছিল বিগত কয়েকদিন। আমার পাশের ঘরটিতেই ছিল। ঝড়ের পর কি সে ফিরে এসেছে?"

সনাতন ঘাড় নেড়ে বলল ঝড়ের সময় সেও এখানে ছিল না। আজ দুপুরেই ফিরেছে। কাজেই তার পক্ষে সঠিক বলা মুশকিল।

— "আপনি ঘর দেখে আসেন। ওখানে যদি থাকেন।"

প্রদ্যুম্নবাবু উঠে গেলেন দোতলায়। নাহ। পর পর দুটো ঘরই ফাঁকা। তাঁর নিজের মালপত্র যদি থেকে থাকে তাহলে মন্দিরেই কোথাও রয়েছে। সাথে সম্বল বলতে শুধু মানিব্যাগ আর গায়ের কাপড়টা। কৃপার পরিণতির কথা ভেবে মনটা খচ্ খচ্ করতে লাগল। সেনা ছাউনিতে ফিরে গিয়ে একবার খোঁজ নেবেন নাকি ঝড়ের পরদিন সকালে-সমুদ্রের ধারে গেরুয়া-বসন, ন্যাড়া মাথা বছর বাইশের কারোর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে কিনা...।

প্রদ্যুম্নবাবু নিচে এসে সনাতনকে বললেন কলকাতার ইসকনের নম্বরটা টেলিফোনে ধরে দিতে। সনাতন দিল। বার তিনেক রিং হওয়ার পর একজন ফোন ধরলেন।

— "হ্যালো নমস্কার। আমি পুরী ইসকন আশ্রম থেকে কথা বলছি। আপনাদের এক তরুণ সন্ন্যাসী বিগত কয়েকদিন ধরে আমার সফর সঙ্গী ছিলেন। ঝড়ের কারণে আমরা আটকে পড়ি, তারপর থেকে ওনার আর কোনও খোঁজ পাচ্ছি না। উনি কি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন?"

ওপারের পুরুষ কণ্ঠস্বর বেশ মার্জিত আর ভদ্র। প্রদ্যুম্নবাবুর কথা শুনে

বেশ উদবিঘ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, "পুরীতে রথ উপলক্ষে আমাদের আরেকটি দলও গিয়ে আটকে পড়েছিল। আজ সকালে ফিরল তাঁরা। আপনার সাথে যিনি ছিলেন তাঁর নাম কী?"

— "নাম কৃপাসিন্ধু। পদবী বলেননি।"

কয়েক সেকেন্ড কোনও উত্তর নেই।

প্রদ্যুম্নবাবু প্রশ্ন করলেন, "শুনতে পাচ্ছেন?"

— "আজ্ঞে ওই নামে তো কেউ... বয়স কেমন হবে?" ওপারের কণ্ঠস্বরে ধোঁয়াশা।

— "তা বছর তেইশ-চব্বিশ।"

— "বাঙালি?"

— "আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরোদস্তুর।"

— "নাহ, অত কম বয়সী বাঙালি সেবাইত তো কেউ নেই এখানে। একজন বছর চব্বিশের গোঁসাই আছেন বটে তবে সে ঝাড়খণ্ডের... আপনি ঠিক জানেন? সে কলকাতা ইসকনের অন্তর্ভুক্ত?"

প্রদ্যুম্নবাবু আর কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দিলেন। হাত কাঁপছে তাঁর! তিনি কার সাথে সময় কাটালেন এতদিন? সেই ধউলি এক্সপ্রেসে আলাপ... 'কৃপা' নিজে তাকে বলেছিল সে ইসকনের প্রভু চিন্ময়ানন্দর কাছে দিক্ষিত হয়ে কলকাতা ইসকনের সাথে যুক্ত হয়। তাহলে কি সব মিথ্যে? কিন্তু কেন? তাঁকে মিথ্যে বলার প্রয়োজন কি ছিল? কিন্ত তার বেশভূষা, কথাবার্তা... সবই যে সন্ন্যাসীসুলভ!...

ভাবতে ভাবতে বসে পড়লেন প্রদ্যুম্নবাবু। পাঁজরার ব্যাথাটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। পুবের আকাশে আবার মেঘ ঘনিয়ে আসছে। দু'জন সাফাই কর্মী একটা বড়সড় বাক্স অফিসের দুয়ারে এনে রাখল। জিজ্ঞেস করতে জানতে পারলেন বৈকুণ্ঠপতি মারা যাওয়ার পর এই প্রথম তাঁর ঘরটা সাফ করা হোল। তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেলে পর ঘরটা অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে।

শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে বাগান জুড়ে। প্রদ্যুম্নবাবুর শীত শীত করতে লাগল। উনি এগিয়ে গিয়ে বাক্সর ডালা খুলে ভেতরে উঁকি মারলেন। গোটা কতক

কৌপীন, এক জোড়া গেরুয়া লুঙ্গি, কিছু ছোটখাটো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়াও তার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকখান বই। প্রায় সবকটা বইই একরকম দেখতে। কালো চামড়ায় মোড়ানো। ওপরে কোনও নাম নেই। এক ঝলক দেখলে পুরনো ডায়েরি বলেও ভুল হতে পারে। ... তাদের মধ্যে একটা বই তুলে নিলেন প্রদ্যুম্নবাবু। প্রথমে বেশ কয়েক পাতা খালি। তারপর একের পর এক পাতায় শুরু হল ছবি। প্রথমে চক্রাকার সব নকশা, তারপর একে একে যেন ছবির বীভৎসতা বাড়তে লাগল। এমন সব প্রাণীর কিম্ভূত-কিমাকার হাতে আঁকা ছবি বেরোতে লাগল যাদের ইহজগতে আদৌ অস্তিত্ব আছে বলে প্রদ্যুম্নবাবু কখনও শোনেননি!

দ্বিতীয় বই তুলে নিলেন প্রদ্যুম্নবাবু। সেই একই ব্যাপার। প্রথম কয়েক পাতা খালি। তারপর বেরোল লেখা। ভাষাটা উড়িয়া। বাংলা করলে যার মানে দাঁড়ায় 'বলিদান'! আঁধার যোগে মহাপিশাচ মতে কতরকম ভাবে বলিদান সম্ভব তার কদর্য সব বিবরণ! চোখের পাতা চিরে রক্ত নিবেদন! মৃত গর্ভবতী নারীর মুণ্ডুচ্ছেদের পর তার গর্ভের সন্তান জীবিত নারীর গর্ভে প্রতিস্থাপন ও তাঁর মধ্যে পুনরায় পৈশাচিক প্রাণ স্থাপন করার উপায়... গা গুলিয়ে উঠল প্রদ্যুম্নবাবুর। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বইটা...

ঘুরে চলে আসছিলেন। হঠাৎ সোনালী মলাটে মোড়া একটা ছোট্ট বই কাপড়ের ভেতর থেকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তুলে নিলেন সেটা। হাওয়াটা যেন বাড়ছে।

— "অন্দরে এসে খাড়া হোন না বাবু।" পেছন থেকে সনাতন ডাকল।

প্রদ্যুম্নবাবু যেন শুনেও শুনলেন না। কেমন যেন অবসন্ন লাগছে তাঁর। হাতের বইটা যেন হঠাৎ ভারী হতে শুরু করেছে। কিছু একটা হচ্ছে তাঁর সাথে। শরীরটা হঠাৎ এমন হালকা লাগছে কেন। এই বইটা! না, এটা খুলবেন না তিনি... কিছুতেই না...

— "খোলো..."

— "কে? কে কথা বলল?" মাথা ঝাঁকালেন প্রদ্যুম্নবাবু ...

— "খুলে দেখো কী আছে ভেতরে..."

প্রদ্যুম্নবাবু যেন মাথার মধ্যে এক চূড়ান্ত আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন। কি মারাত্মক তার টান! সে যা বলবে তা যেন করতেই হবে... তাঁর আঙুলগুলো যেন অবশ হয়ে বইয়ের মলাটের ওপর এসে খুলে দিল বইটাকে।

বৃষ্টি নামলো আবার।

বইয়ের প্রথম পাতায় একটা ছবি। এই আকৃতিটি তিনি আগে দেখেছেন। কদাকার মনুষ্যশিশুর মতো চেহারা... শুধু একটার বদলে তিনটে মাথা!

বুকের ভেতরটা যেন ভারী হয়ে আসছে তাঁর। ভয় করছে কিন্তু বইটা চেষ্টা করেও হাত থেকে ফেলে দিতে পারছেন না তিনি। উলটে ফেললেন পরের পাতা। উড়িয়ায় লেখা একটা শব্দ... বাংলায় যার অর্থ 'মুক্তি'।

বইটি হাতে লেখা। কিছু জায়গায় কালি অস্পষ্ট, কিছু জায়গায় হাতের লেখা পড়ার অযোগ্য।

তবু যেন প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়ে চললেন প্রদ্যুম্নবাবু।

"...আষাঢ়ের অমাবস্যা! যেই রাতে মন্দিরে ব্রহ্ম পরিবর্তন হয়। সেই রাতে আমার আত্মাহুতি জন্ম দেবে এক বিষাক্ত শ্রাপের, যা রোগের মতো খেতে থাকবে শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত শুভ লক্ষ্মণ। মাঝরাতে যখন অষ্টগ্রহ সমন্বয় হবে তখন আমার বিদেহি আত্মা স্থান নেবে পিশাচযজ্ঞের ভস্মের মধ্যে। দেব ভক্তির নামে এই মিথ্যাচার চিরকাল বন্ধ হয়ে যাবে এই পুণ্যভূমিতে! আমার দেবতা হবে একমাত্র দেবতা! তাঁর উপাসনা হবে একমাত্র উপাসনা!

কিন্তু এক আহুতি পিশাচতন্ত্র বিরুদ্ধ। ফিরতে আমায় হবেই। নিজের আহুতি আবার দিতে হবে। চব্বিশ বছর পর পুনরায় অষ্টগ্রহ সমন্বয় হবে। আমি সেদিন ফিরব। নবজন্ম নিয়ে হলেও ফিরব। পুনরায় আষাঢ়ের অমাবস্যায় নিজের আহুতি দিয়ে মুক্ত করবো এই পিশাচযজ্ঞের ভস্ম! ততদিন এই বিভূতিকুম্ভ ভূমিগর্ভে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। সেইদিন হবে আমার মুক্তি। সেইদিন বিদেহী আত্মা থেকে উত্তরণ হবে আমার। দেবতার সাজানো ভূমিতে পাতাল থেকে নবজন্ম নেব আমি সম্পূর্ণ অপদেবতা রূপে! মিশে যাবো কায়াহীনদের দলে... সর্বশক্তিমান হয়ে!"

আকাশ কাঁপিয়ে মেঘ গর্জন করে উঠল। ঝনঝনিয়ে উঠল জানলার কাচ।

— "বাবু?"

বৃষ্টির মধ্যে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রদ্যুম্নবাবু।

— "ভিজছেন কেন? অন্দরে আসুন।" সনাতন আবার হাঁক দিল। নড়লেন না প্রদ্যুম্নবাবু। যেন কথা কানেই যাচ্ছে না তাঁর। মূর্তির মতো নিশ্চল...

খটকা লাগল সনাতনের। পায়ে পায়ে বেড়িয়ে এসে তাকাল প্রদ্যুম্নবাবুর মুখের দিকে। তাঁর মুখ পাথরের মতো স্থির। চোখের মণি স্থির হাতে ধরা বইয়ের ওপর। উঁকি মারল সনাতন। কই বইয়ের পাতা তো খালি। কিছু তো নেই!

হঠাৎ নাকে একটা বিকট গন্ধ গেল সনাতনের। গন্ধটা আসছে প্রদ্যুম্নবাবুর গা থেকে! যেন তাজা জীবিত মানুষের শরীরে হঠাৎ পচন ধরেছে!

— "বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে কী পড়ছেন বাবু?"

প্রদ্যুম্নবাবু উত্তর দিলেন না। মুখ খুললেন। গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরোল। বার বার করতে লাগলেন সেই একই রকম শব্দ। বইয়ের 'সাদা' পাতার ওপর চোখের মণি সরতে লাগল— বাঁদিক থেকে ডানদিকে। যেন কোনও অদৃশ্য লেখা শুধু তাঁর চোখে ধরা পড়ছে! ভয়ে পিছিয়ে এল সনাতন! এবার গলা তুললেন প্রদ্যুম্নবাবু। সেই দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ! যেন একটানা মৃত্যুপথযাত্রীর গোঙানি! যেন নরকযন্ত্রণায় কাতরানোর শব্দ! সেই নারকীয় প্রার্থনা করে চলেছেন প্রদ্যুম্ন মজুমদার! চোখে ভাষা নেই। মুখে অভিব্যক্তি নেই! যেন এক জীবন্ত লাশ।

সেখান থেকে দূরে মন্দিরে এখন ভক্তের সংখ্যা কম। পুরীর পরমেশ্বর এখন অবস্থান করছেন পুরীর বাইরে!

মন্দিরের গর্ভগৃহ আজ ফাঁকা!



বলিদান



শিপ্রা নদীর পাড়ে তেঁতুল আর নিম গাছে ঘেরা ছোট একটা শ্মশান। শ্মশানের চৌহদ্দি ছোট হলেও তাকে ঘিরে গজিয়ে ওঠা জঙ্গলটা নেহাত ছোট নয়। শ্মশানের সবচেয়ে কাছের জনবসতি প্রায় মাইল খানেক দূরে। চিতাকুণ্ডের থেকে কিছুটা দূরে ছোট্ট একটা চালাঘর। তার ভেতর আরো ছোট একটা খুপরির মধ্যে একটা কোষ্ঠী পাথরের কালী মূর্তি। শ্মশানযাত্রীরা শব দাহ করার পর কখনও কখনও এই মন্দিরে পুজো দিয়ে যায়। বৃষ্টির সময় মন্দিরের টিনের চালের তলায় তারা আশ্রয়ও নেয়।

বৃদ্ধ পবন দ্বিবেদী মহাশয় এই মন্দিরের নিত্য পূজারী। সারাদিন মন্দিরে কাটিয়ে রাতে উনি গ্রামে ফিরে যান। উনি একলা বৃদ্ধ মানুষ। বিপত্নীক। ছেলে

এলাহাবাদে কাজ করে। সারাদিনে শ্মশানযাত্রীদের থেকে দক্ষিণা স্বরূপ যা পান তাতে তাঁর বেশ চলে যায়। সূর্য ডোবার আগে মন্দিরে সন্ধ্যাপূজা করে উনি রোজ অন্ধকার নামার আগে বাড়িমুখো হন। আবার পরদিন ভোরে মন্দিরে চলে আসেন।

বর্ষাকাল। আজ সকালে মন্দিরে আসতে অন্যদিনের তুলনায় একটু দেরি হয়েছে পুরোহিত মশাইয়ের। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। চিতাকুণ্ডর তলায় টাটকা ছাই থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে উনি বুঝলেন হয়তো শেষরাতে বা সূর্যোদয়ের আগেই কাউকে দাহ করা হয়েছে। দ্বিবেদী মশাই সজ্জন লোক। যদি দাহ করার পূর্বে ও পরে শববাহকদের কেউ ওনাকে ধর্মীয় উপাচার কিছু করার জন্য অনুরোধ করেন, উনি কাউকে প্রত্যাখ্যান করেন না। কেউ অনুরোধ না করলেও দেহ ছাই হয়ে গেলে প্রত্যেক চিতায় উনি নিজের গরজেই নদীর জল ছিটিয়ে শান্তি মন্ত্র পড়ে দেন। এ ওনার বহুকালের অভ্যেস।

আজও তার অন্যথা হয়নি। উনি মঙ্গলঘট থেকে নদীর জল অঞ্জলিতে ভরে শান্তিমন্ত্র পড়তে পড়তে ছাইতে ছিটিয়ে ফিরে এলেন মন্দিরে। মেঘ করেছে আকাশে। সূর্যের মুখ একবারও দেখা যায়নি আজ। তবে বর্ষাকাল হলেও গুমোট ভাবটা মোটেও কাটেনি। মন্দিরের সোজাসুজি একশো মিটার দূরে ঢালু হয়ে একটা পাথুরে টিলা উঠে গেছে। তার গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ। সেটার দিকে চোখ যেতেই পুরোহিত মশাই থমকে গেলেন। আশপাশের প্রত্যেকটা গাছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। অথচ নিমগাছটা অমনভাবে দুলছে কেন!

পুরোহিত মশাইয়ের বয়স হলেও চোখের জ্যোতি বেশ প্রখর। কই, গাছটার গোড়ায় তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না! অথচ ডালপালাগুলো এমনভাবে উথাল-পাথাল করছে যেন কেউ গোটা গাছটাকে ধরে অবলীলায় নাড়িয়ে যাচ্ছে। গাছটা এতটাই মোটা আর উঁচু যে শ্মশানের চৌহদ্দির বাইরেও অনেকদূর থেকে সেটাকে দেখতে পাওয়া যায়। একজন মানুষ তো কোন ছার, জনাদশেক মিলে নাড়ালেও গাছটা এতটা দোলার কথা নয়।

হাতের ঘটটা নামিয়ে রেখে পুরোহিত মশাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন

গাছটার গোড়ায়। যেতেই একটা বিশ্রী শব্দ কানে এল তাঁর। একসাথে কয়েক হাজার মাছির গা-ঘিনঘিনে গুঞ্জনের শব্দ। গাছের পেছন দিকে যেতেই গা গুলিয়ে উঠল পুরোহিত মশাইয়ের!

মোটামোটা শেকড়ের ওপর পড়ে রয়েছে একটা লাশ! মহিলার। পরনে শত ছিন্ন মলিন শাড়ি। গলার নালী কাটা! ক্ষতর জায়গাটা হাঁ হয়ে রয়েছে। সম্ভবত ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে এক ঝটকায় অনেকটা জোরে কেটে ফেলা হয়েছে। তার ওপর সম্ভবত কাল রাতে শেয়াল বা শকুনি রক্তের গন্ধে ক্ষত জায়গাটা ধরে কামড়া-কামড়ি করে মুণ্ডুটা প্রায় ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সামান্য চামড়ায় জুড়ে রয়েছে ধড়ের সাথে। এলো খোলা ভিজে চুল বিছিয়ে রয়েছে গাছের শেকড়ের ওপর জুড়ে। চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন পুরোহিত মশাই। সেই দুটো যেন বিস্ফারিত হয়ে তাঁকেই দেখে যাচ্ছে!

ছিটকে সরে এলেন তিনি। তাঁর হাত পা কাঁপতে আরম্ভ করল। এবার তিনি দুটো জিনিস খেয়াল করলেন। এক, গতকাল রাতে বৃষ্টি হলেও শেকড়ের তলায় এখনও রক্তের দাগ স্পষ্ট। এত রক্ত এখানে বেড়িয়েছে মানে সম্ভবত একে এখানেই মারা হয়েছে। দ্বিতীয়, দেহের ডান হাতের থেকে একটু দুরেই একটা প্রায় দেড়ফুট লম্বা চপার গোছের অস্ত্র তিনি দেখতে পেলেন। কাদার মধ্যে ঘষ্টানোর দাগ এটা স্পষ্ট করে দেয় যে এই দেহ নিয়ে নিশাচর মৃতভুখ প্রাণীরা রাতে টানাটানি করেছে।

এক দৌড়ে স্থানত্যাগ করলেন পবন দ্বিবেদী। বেলা বাড়তে সদর (দক্ষিণ) ফাঁড়ির গোটা চারেক পুলিশ এসে দেহ প্লাস্টিকের থলেতে মুড়িয়ে নিয়ে গেল। আশপাশের গ্রাম থেকে জনা চারেক লোক খবর পেয়ে এসেছিল বটে তবে তারা কেউই কিছু আলোকপাত করতে পারল না। বড়বাবু পুরোহিত মশাইকে টুকটাক প্রশ্ন করে দায়িত্ব সেরে হাওয়া হয়ে গেলেন।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি নামল। আজ অন্যদিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলেন পুরোহিত মশাই। সকালে ওই দৃশ্য দেখার পর থেকে হাত পা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। ছোট্ট টিনের চালা দেওয়া বাড়ি। পাশাপাশি এক

জোড়া ঘর। একটাতে উনি নিজে থাকেন, আরেকটা খালিই থাকে, কালেভদ্রে ছেলে এসে মাঝে মাঝে থেকে যায়। দ্বিবেদী মশাই বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। বুকের কাছে কিছু যেন একটা আটকে আছে। উনি প্রাণপণে অস্বস্তিটাকে অস্বীকার করতে লাগলেন কিন্তু ওনার মন জানে বুকের বোঝাটা আসলে কীসের কারণে...

চোখ বন্ধ করতেই ভেসে এল ঠিক একমাস আগের সেই ভয়াল স্মৃতি। সেদিন অমাবস্যা দুপুর দুপুর করে লেগেছিল তাই উনি বিকেলের মধ্যে তিথির পূজা সেরে বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছেন এমন সময় দু'জন লোক এসে মন্দিরের বাইরে দাঁড়ালো। একজনের কোলে একটা বছর আটেকের বাচ্চা ছেলে। ঘুমন্ত!

বাচ্চাটিকে ভালো করে দেখলেন দ্বিবেদী মশাই। সত্যিই সে ঘুমিয়ে আছে নাকি অন্য কিছুর ঘোরে নেতিয়ে রয়েছে? সন্দেহ হল দ্বিবেদী মশাইয়ের। পেছনের জন এগিয়ে এসে বলল আজকের অমাবস্যায় তারা ডাকিনি-তন্ত্র মতে চামুণ্ডার উদযাপন করতে চায়। তাদের হয়ে পূজা সম্পন্ন করে দিতে হবে। দ্বিবেদী মশাই প্রথমেই দু'জনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন। দু'জনের একজনকেও ঠিক 'ভদ্রলোক' বলা যায় না। সম্ভবত দু'জনেই মাদকাসক্ত। উনি সাফ জানিয়ে দিলেন তন্ত্রমতে কোনও রকম উপাচার পালন করার মতো দক্ষ পুরোহিত উনি নন। তারা যেন অন্য জায়গায় তাদের পূজা সম্পন্ন করে। তারা বলল বিশ মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় কোনও শ্মশান নেই। তাদের এই পূজা শ্মশানকালীর মন্দির ছাড়া সম্পন্ন করা অসম্ভব। তারা দু'জনেই পাউরির (এক ধরনের উত্তর ভারতীয় জুয়া) নেশায় অনেক টাকা হেরেছে, পরের পাউরিতে যাতে তারা জেতে তাই তাদের গুরুর নির্দেশে তারা এই পূজা সম্পন্ন করতে চায়।

— "বাচ্চাটিকে দিয়ে কী হবে?" উনি শক্ত গলায় প্রশ্ন করেন।

— "মা চণ্ডিকার পূজা ভোগ ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে। আট বছরের ব্রাহ্মণের সন্তান মায়ের ভোগের জন্য আদর্শ।"

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল দ্বিবেদী মশাইয়ের। এরা নরবলি দিতে চায়!

— "আমি মন্দির বন্ধ করে দিয়েছি। আপনারা কারা এবং কী মতলবে এসেছেন আমি জানি না কিন্তু আমি আপনাদের পূজা করবো না। আর এই পাপ আপনাদেরও করতে দেবো না!" রুখে দাঁড়ালেন দ্বিবেদী মশাই। ওনার শরীর যদিও বয়সের ভারে দুর্বল কিন্তু উনি সাত্ত্বিক মানুষ। জীবনে কখনও মিছে কথা বলেননি।

হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সামনের জন দ্বিবেদী মশাইকে দিল এক মোক্ষম ধাক্কা। পাথুরে মেঝের ওপর ছিটকে পড়লেন বৃদ্ধ। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ঝোলা থেকে লোকটা টেনে বের করল একটা প্রায় দু'হাত লম্বা চকচকে ইস্পাতের খাঁড়া!

— "তুই পূজা না করলে সবার আগে তোর মাথা দিয়ে চণ্ডিকার অভিষেক করবো!" হাড় জিরজিরে লোকটার গলার কাছে ঝুলে পড়া চর্বি থরথর করে কেঁপে উঠল! ভয়ে জমে গেলেন দ্বিবেদী মশাই।

খোলা হোল মন্দির। জ্বলে উঠল যজ্ঞকুণ্ড। রাগে, আতঙ্কে, দুঃখে পূজার মন্ত্র সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেল ওনার মাথার মধ্যে। যজ্ঞের আগুনের কম্পমান আলোয় পাথরের মূর্তি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাচ্চাটিকে শোয়ানো হোল কুণ্ডের পাশে। দ্বিবেদী মশাই প্রাণপণ মা কালীকে আকুতি করে যেতে লাগলেন যেন এই সময়ে কোনও শবযাত্রীর দল শ্মশানে আসে। ফুটফুটে বাচ্চাটা প্রাণে রক্ষা পাবে...

গৃহীত হোল না ওনার প্রার্থনা... জগত্তারিণী এই নৃশংস হত্যালীলা হতে দেখেও পাথর হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বিবেদী মশাই হাতজোর করে মিনতি করলেন যে তিনি পূজা সম্পন্ন করে দিয়েছেন, অন্তত বলি নিবেদন যেন তাঁর চোখের সামনে না করা হয়। এই বয়সে তিনি এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পারবেন না।

এক ধাক্কা মেরে দ্বিবেদী মশাইকে মন্দিরের বাইর বের করে দেওয়া হল। উনি পেছনদিকে না তাকিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যত জোরে সম্ভব দৌড়োতে আরম্ভ করলেন। বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে। বৃদ্ধ কিছুটা গিয়ে বুক ধরে বসে পড়লেন। চারদিকে কালো জঙ্গলের দেয়াল

ঘুটঘুটে অন্ধকারে যেন তাকে গিলতে আসছে! তাঁর আর একটুও নড়ার ক্ষমতা নেই। বুকের ভেতরে ফুসফুসটা যেন শুকিয়ে গেছে। আর একটুও শ্বাস টানার ক্ষমতা নেই তাদের...

অতটুকু একটা শিশু... তাকে কিনা...

হঠাৎ... পায়ের আওয়াজ... কাদার মধ্যে একসাথে অনেক জনের এগিয়ে আসার শব্দ। মুখ তুলে তাকালেন দ্বিবেদী মশাই। দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে কয়েকখানা আলোর বিন্দু চোখে পড়ল... আর তারপর সমবেত কণ্ঠস্বর...

"রাম নাম... সত্য হ্যায়... রাম নাম সত্য হ্যায়..." — শ্মশানযাত্রীর দল!

লণ্ঠন হাতে একদম সামনে যেই জনৈক ব্যক্তি হাঁটছিলেন দ্বিবেদী মশাই তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে হামলে পড়লেন। শ্মশানযাত্রীদের অনেকেই এর আগে বহুবার এসেছেন শ্মশানে কাজেই দ্বিবেদী মশাইকে চিনতে তাদের অসুবিধে হোল না। উনি হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদেরকে সব বললেন। গোটা তিনেক সবল চেহারার জোয়ান ছেলে দ্বিবেদী মশাইয়ের সাথে আগে আগে শ্মশানের পথে এগিয়ে গেল।

মন্দিরের সামনে এসে দ্বিবেদী মশাই দেখেন চারিদিকে ঝিমঝিমে নিস্তব্ধতা। জনমানবহীন শ্মশানে শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক আর টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ। উনি এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের দরজা খুলে দিতেই দেখেন যজ্ঞকুণ্ড থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আগুন নিভে গেছে আর ভেতরটা খাঁ খাঁ ফাঁকা। যাক, তাহলে এরা পালিয়েছে। বাইরে লণ্ঠন হাতে তিনটি জোয়ান ছেলে অপেক্ষা করছিল। সেই লণ্ঠনের আলো অল্প পড়ছিল মন্দিরের গর্ভগৃহে। স্তিমিত আলোয় চকচক করছিল কালীমূর্তি। দ্বিবেদী মশাই ঘুরে বেরোতে যাবেন, এমন সময় মেঝেতে পড়ে থাকা তরল কিছু পায়ে ঠেকল! একপা সামনে নিতেই পায়ে ধাক্কা খেয়ে ফুটবলের মতো যে জিনিসটা গড়িয়ে বাইরে লণ্ঠনের সামনে গিয়ে পড়ল, তাই দেখে তিনজন জোয়ান ছেলে আঁতকে উঠল! আধবোজা চোখ আর মুখ হাঁ করা সেই আট বছরের ছেলেটির কাটা মুণ্ডু খোলা আকাশের নিচে বৃষ্টির জলে স্নান করতে লাগল!

ধড়মড়িয়ে চৌকিতে উঠে বসলেন দ্বিবেদী মশাই। ভোর হয়ে গেছে কি?

মাথার পেছনের জানলাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন পুবের আকাশে কমলার আভা ধরেছে। কীসের শব্দ? টিনের দরজাটার ওপর যেন মৃদু টোকা পড়ছে। এত ভোরে কে হতে পারে? টালমাটাল অবস্থায় উনি উঠে দরজাটা খুললেন। আর খুলেই যে ব্যক্তির সম্মুখীন হলেন, ওঁকে দ্বিবেদী মশাই দেখছেন আজ প্রায় বারো বছর পর। ছ'ফুটের ওপর উচ্চতা, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, মাথার চুল ধবধবে সাদা, পরনে খদ্দরের কুর্তা আর সাদা লুঙ্গি, এক কাঁধে একটা ঝোলা আর অন্য হাতে ধরা একটা যষ্টি। ঘোলাটে চোখ দুটোর ওপর ঘন সাদা ভুরুর আবরণ। দেখলে কে বলবে এই মানুষটির বয়স প্রায় নব্বই?

দ্বিবেদী মশাইয়ের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

"গুরুদেব!" বলেই নুয়ে পড়ে পায়ে প্রণাম করলেন সৌম্য দর্শন মূর্তিটির।

আচার্য্য সদাশিব চতুর্বেদী বাইশ বছর বয়সের পবন দ্বিবেদীকে দিক্ষা দেন। তারপর তিন বছর দ্বিবেদী মশাই আচার্য্যর সাথে দেশভ্রমণ করে শাস্ত্রর জ্ঞানার্জন করেন। এক সময় আচার্য্য দ্বিবেদী মশাইকে বলেন যে মোক্ষের পথ দ্বিবেদী মশাইয়ের জন্য নয়। যার মন থেকে পরিবার চিন্তা ত্যাগ হয়নি, সে সন্ন্যাস নেবার অযোগ্য। তবে ওঁর মনে সাত্ত্বিক ভাব রয়েছে, উনি চাইলে সারা জীবন দেবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতেই পারেন। এও এক প্রকার মোক্ষই বটে। তারপর দ্বিবেদী মশাই গ্রামে ফিরে এসে বিবাহ করেন এবং সংসারধর্ম পালনে ব্রতী হন।

বছর বারো আগে ওঁর স্ত্রীর ও ছেলে একসাথে বিছানা নেয়। দু'জনেরই একসাথে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। অনেক খুঁজে দ্বিবেদী মশাই কনখলের আশ্রমে ওঁর গুরুদেবের হদিশ পান। সেখানে গিয়ে তিনি হত্যে দেন আচার্য্যর পায়ে। ওঁকে অনুরোধ করেন ওঁর পরিবারকে এই মহাসঙ্কটের সময় থেকে রেহাই দিতে।

গুরুদেব বলেন যে ওঁর পরিবারে মৃত্যুযোগ অনিবার্য। একটি প্রাণ সে নেবেই। হয় স্ত্রীর না হয় ছেলের। কাকে সে হারাতে প্রস্তুত সেই নির্ণয় নিতে হবে দ্বিবেদী মশাইকেই। দ্বিবেদী মশাই কোনও উত্তর দিতে পারেননি। তাই

দেখে গুরুদেব মৃদু হেসে বলেন, "আমরা বেঁচে থাকি আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। যে জীবনে ভবিষ্যৎ-কামনা নেই, সেই জীবন থাকাও যা, না থাকাও তা। পবন, তোর ছেলে তোর ভবিষ্যৎ। মাত্র বাইশ বছর বয়স তার। তার মৃত্যু হলে তোর স্ত্রী এমনিতেও আর সেরে উঠবেন না। তার বেঁচে থাকাটাই শ্রেয়। তবু তুই যদি চাস তোর স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতেই পারিস।"

দ্বিবেদী মশাই সেদিন কোনও উত্তর দিতে পারেননি। তার দু হপ্তার মধ্যে ওঁর স্ত্রী চলে গেলেন এবং ছেলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। একথা ঠিক যে তিনি ওঁর গুরুদেবকে কখনও অসম্ভব অলৌকিক কিছু করতে দেখেননি ঠিকই কিন্তু ওঁর দিব্যজ্ঞান ও ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে থাকলে মন শান্তি পায়, সবকিছু ওঁর কাছে সঁপে দিতে মন চায়, মনে হয় উনি মনের ভেতরটা পুরোটা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু উনি কীভাবে জানলেন পবন দ্বিবেদীর ঠিকানা? আর এত বছর পর কোনও খবর না দিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে তার কাছে সশরীরে চলেই বা এলেন কীভাবে?

গুরুদেব খানিকক্ষণ ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইলেন দ্বিবেদী মশাইয়ের দিকে। দ্বিবেদী মশাই নড়লেন না ওঁর জায়গা থেকে।

—"তোকে বলেছিলাম অষ্টগ্রহ সমন্বয়ের সময় অশুচি থেকে দূরে থাকবি!"

গুরুদেব কথাটা এমনভাবে বললেন যেন চাপা মেঘের গর্জন! ওনার ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা ফাঁকা হয়ে গেল দ্বিবেদী মশাইয়ের। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে গুরুদেবকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলেন দ্বিবেদী মশাই।

তাঁর মনে পড়ল আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে আষাঢ়ের অমাবস্যায় অষ্টগ্রহ সমন্বয় হয়েছিল। উনি রুদ্রপ্রয়াগের আশ্রমের ঠিকানা থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলেন গুরুদেবের। সেখানে তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে অমাবস্যায় অষ্টগ্রহ সমন্বয় এমন এক মহাজাগতিক ঘটনা যা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সবচেয়ে অশুভ সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সময়ে মৃত ও অমৃতলোকের মধ্যেকার পথ হয় সবচেয়ে সুগম, তাই অপশক্তিরা চেষ্টা করে অধম জগৎ থেকে উত্তম জগতের পথে নিজেদের উত্তরণ ঘটানোর। গুরুদেব এও লেখেন দ্বিবেদী

মশাই কুম্ভ রাশি তুলা লগ্নের জাতক তাই ওঁর এই সময় যেকোনো অশুভ কিছুর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা উচিৎ। কেন? তা তিনি বলেননি।

— "কিন্তু গুরুদেব, আপনি এত দূর থেকে হঠাৎ? আর আমার ঠিকানাই বা পেলেন কীভাবে?" দ্বিবেদী মশাই গুরুদেবের পায়ের কাছে মেঝেতে বসলেন। গুরুদেব বসলেন চৌকিতে।

কাঁধের ঝোলাটা পাশে নামিয়ে রেখে বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন, "বহু বছর হয়ে গেল রাতে আমার ঘুম প্রায় হয়ই না। কিন্তু গত পরশুর আগের দিন রাতে বেশ ঘুম পেল। কনখলের আশ্রমে জায়গার অভাব নেই। তাই আমার শোবার জন্য সেবাইতরা একটা বড় ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। কতক্ষণ চোখ লেগে ছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ যেন দেখলাম জঙ্গলে ঘেরা একটা শ্মশান। কাতারে কাতারে চিতা জ্বলছে সেখানে। গোধূলির আলোয় বোঝার উপায় নেই সময়টা ভোর না সন্ধে। তার মধ্যে দেখলাম ছোট্ট একটা মন্দির। চিতার ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে চারিদিক। সেই ধোঁয়ার মধ্যে দেখলাম তোকে। তুই পূজার ডালি সাজিয়ে মন্দিরে ঢুকছিস। তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে যে মুহূর্তে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলি সেই মুহূর্তে..." — থামলেন গুরুদেব। ওঁর শ্বাস চড়ে গেছে।

"সেই মুহূর্তে কি হোল গুরুদেব?" দ্বিবেদী মশাইয়ের গলায় কৌতূহল মিশ্রিত ভয়।

— "দেখলাম, তুই মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করার সাথে সাথে তোর মাথাটা ফেটে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মন্দিরের মেঝেতে! আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম। দৌড়ে এল সেবাইতরা। ডাক্তার ডাকা হোল, রক্তচাপ তুঙ্গে উঠে গেছিল। বড়ি লিখে দিলেন উনি। তার সাথে ঘুমের ওষুধ। কিন্তু মনটা খচ্ খচ্ করতে লাগল। তোকে শেষ যেই ঠিকানায় চিঠি লিখেছিলাম সেটা ছিল আমার কাছে। একজন তরুণ সেবাইতকে নিয়ে সকালেই বেড়িয়ে পড়লাম। রেলে উজ্জৈন তারপর ষ্টেশন থেকে বাসে মঙ্গলগাঁও। সেখানে কাল রাতে রাত্রিবাস করে আজ শেষ রাতেই বেড়িয়ে পড়েছিলাম মাধবগড়ের উদ্দেশে। আমায় তোদের গ্রামের দোরগোড়ায় পৌঁছে সেবাইতটি ফিরে গেছে।"

দ্বিবেদী মশাইয়ের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা রক্তের স্রোত নেমে গেল! হঠাৎ

যেন ভয়ে গলার কাছটা শুকিয়ে গেল ওনার।

— "তোকে সাবধান করেছিলাম! এই সময়টা বড্ড খারাপ বাছা, এই সময় যে কোনো অশুভ কিছুর থেকে দূরে থাকবি..."

— "কিন্তু, আমি তো নিয়মিত ওই মন্দিরে পূজা করি। এছাড়া তো অশুভ কিছু..." দ্বিবেদী মশাই গুরুদেবের কথা কেটে বলতে গেলেই গুরুদেব তাঁকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন।

"আমি যেমন মন্দিরের বর্ণনা দিলাম তেমন?" দ্বিবেদী মশাই ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়লেন।

এরপর গুরুদেব যেই কাজটা করলেন সেটা এমন সময় একটু বেখাপ্পাই লাগল দ্বিবেদী মশাইয়ের। উনি নিচু হয়ে দ্বিবেদী মশাইয়ের শরীরের খুব কাছে এসে লম্বা শ্বাস টানলেন। তারপর চোখ বুজে সোজা হয়ে বসলেন।

— "তুই বিকট কোনও অপশক্তির সংস্পর্শে ছিলি বিগত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে! নাক জ্বলে যাচ্ছে তোর গায়ে তাদের গন্ধে। এটাই তার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তুই দুর্বল রাশির জাতক। তোর ওপর তাদের প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি!"

দ্বিবেদী মশাই থুম মেরে বসে রইলেন। খানিকক্ষণ সেভাবে থাকার পর আজ সকালে গাছের তলায় মহিলার লাশ পাওয়ার ঘটনাটা বর্ণনা করলেন।

"শুধু লাশ? সে তো শ্মশানে তুই রোজই দেখিস। আর কিচ্ছু অস্বাভাবিক চোখে পরেনি?"

দ্বিবেদী মশাই ভেবে বললেন, "সম্ভবত মহিলাকে শ্মশানেই আগের দিন রাতে মারা হয়েছে গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মেরে। আজ সকালে যেন দেখলাম সব গাছ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অথচ ওই একটাই গাছ যেন ঝড়ের ঝাপটা খাওয়ার মতো করে দুলছে!"

গুম মেরে গেলেন গুরুদেব। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "খুব ভুল করে ফেলেছিস তুই... প্রচণ্ড বড় ভুল..."

— "কেন গুরুদেব?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন দ্বিবেদী মশাই।

— "কারণ যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তা তুই পাচ্ছিস না।"

গুরুদেব মাথা নিচু করে নিলেন। তিনি ভুলেও পবন দ্বিবেদীকে বললেন না যে এতক্ষণ তার পেছনের টিনের দেওয়ালে পবন দ্বিবেদীর একটার বদলে পাশাপাশি দুটো ছায়া পড়ছিল!

...দ্বিতীয় ছায়াটি একজন মহিলার!

* * * * * * * * * *

রাত নামলো মাধবগড়ে। গ্রামটির জনসংখ্যা মেরে কেটে শ' দেড়েক। বন জঙ্গলে ঘেরা জনবসতিটি সূর্য ডুবলেই নিঝুম হয়ে যায়। গ্রামে বিজলি আছে বটে, কিন্তু কাছাকাছি সাব-স্টেশন না থাকায় ভোল্টেজের অবস্থা প্রায় সারা বছরই শোচনীয় থাকে। একটা বৈ দুটো বাতি জ্বলে না কারোর ঘরেই।

রাত আটটায় সেঁকা বাজরার রুটি আর ছোলার সবজি খেয়ে দুই বৃদ্ধ দুই ঘরে শুয়ে পড়লেন। গুরুদেবকে নিজের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে নিজে পাশে ছেলের ঘরে শুয়েছেন দ্বিবেদী মশাই। কিন্তু ঘুম নেই আচার্য্য সদাশিব চতুর্বেদীর চোখে। রাত ক'টা হবে বোঝার উপায় নেই। চৌকি থেকে উঠে বসলেন তিনি। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। আজ বোধহয় ত্রয়োদশী। অষ্টআশি বছর বয়স হলেও হাঁটা চলায় কোনও অসুবিধে হয় না তাঁর। চোখের দৃষ্টি কিছুটা ঝাপসা হয়ে এলেও, দিব্যি চশমা ছাড়া চলে যায়।

দরজাটা খুলে বাইরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন গুরুদেব। আষাঢ় মাস হলেও আকাশ বেশ পরিষ্কার। ঘুমে ডুবে রয়েছে মাধবগড়। আকাশে তারার ঝাঁকের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে মঙ্গল আর বৃহস্পতি। বাকি গ্রহগুলি দেখা না গেলেও তারা যে পৃথিবীর সমান্তরালে এসে গেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাঙ ডাকছে আশেপাশের ঝোপ জংলার মধ্যে থেকে। হঠাৎ ব্যাঙের ডাক ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ গুরুদেবের কানে এলো। কান খাড়া করলেন বৃদ্ধ। চাপা কঁকিয়ে কান্নার আওয়াজ!

শিরদাঁড়া টান করলেন গুরুদেব। শব্দটা আসছে তাঁর পাশের ঘর থেকে! ওই ঘরেই শুয়েছেন পবন দ্বিবেদী! ঘন সাদা ভুরু দুটো কুঁচকে গেল

গুরুদেবের। দরজা ভেজিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন উনি। পাশের ঘরে একটা লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বালিয়ে ঘরের কোণায় রেখে দেয়া আছে। রাতবিরেতে যদি হঠাৎ আলোর দরকার পড়ে আর তখন যদি বাতি না জ্বলে! এই আশঙ্কায় দ্বিবেদী মশাই রোজ একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে শিখা কমিয়ে রেখে ঘুমোতে যান।

টিমটিমে আলোয় ঘরের কোণায় আলো হলেও বাকিটা অন্ধকার। চৌকিতে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছেন দ্বিবেদী মশাই। হঠাৎ শিষ্যের মুখের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি আটকে গেল তাঁর! চোখ দুটো বিস্ফারিত! সেই ভাবেই মৃদু কেঁপে চলেছে তাঁর শরীর। হাঁ করা মুখ দিয়ে চাপা কান্নার মতো একটা গা শিরশিরে শব্দ বেরোচ্ছে। থেকে থেকে বুকটা এমনভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে যেন দম নেওয়ার জন্য খাবি খাচ্ছেন দ্বিবেদী মশাই!

গুরুদেব এগিয়ে গিয়ে পায়ের নড়া ধরে নাড়া দিতেই কেমন হকচকিয়ে সম্বিত ফিরে পেলেন দ্বিবেদী মশাই।

— "গুরুদেব! এত রাত হয়ে গেল, এখনও ঘুমোননি?"

গুরুদেব তাকিয়ে রইলেন তাঁর শিষ্যের মুখের দিকে। স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। যেন এতক্ষণ কিছুই হয়নি। এই টিমটিমে আলোতেও উনি একটা বিষয় খেয়াল করেছেন যা আর যে কোনো মানুষের চোখ এড়িয়ে যাবে; পবন দ্বিবেদী কথা বলার সময় তাঁর জিভের ডগার যেইটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে, গুরুদেব ভালো করে লক্ষ্য করলেন, সেই জীব গাঢ় কালো রং ধারণ করেছে।

— "কিছু বুঝতে পারছিস? শরীর কি খারাপ লাগছে?" গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন সদাশিব চতুর্বেদী।

— "কই না তো?"

খানিকক্ষণ তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে গুরুদেব বললেন, "বেশ, আমি যা বলছি আমার সাথে তা বল; ওম পরমব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ নমস্তুতে, ওম বাসুদেবায়, শুদ্ধায়, নিত্যায়, শ্রী কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গৌব্রাহ্মণহিতায় নমস্তুতে।"

দ্বিবেদী মশাই মুখ খুললেন, প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত কেউ যেমন ভাবে কথা বলে, তেমন জড়িয়ে জড়িয়ে দুর্বোধ্য কিছু একটা বলে থেমে গেলেন। ওনার মুখ থেকে যা বেরোল তার সাথে গুরুদেবের আওড়ানো মন্ত্রর কোনও মিলই নেই!

থমথমে হয়ে গেল ঘর। দ্বিবেদী মশাই নিজে বুঝতে পেরেছেন যে তিনি দেবমন্ত্র উচ্চারণ করতে পারছেন না! ভয়ে বিকৃত হয়ে গেল ওনার মুখ। গুরুদেব উঠে গিয়ে পাশের ঘরে নিজের ঝোলা থেকে ছোট্ট একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন দ্বিবেদী মশাইয়ের শরীরে। তারপর গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, "রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। এই রোগ মারণ রূপ নেওয়ার আগে কাল আমায় নিয়ে যাবি যেই শ্মশান থেকে তুই এই রোগ বাঁধিয়ে এনেছিস।"

* * * * * * * * * *

— "আত্মিকযোগ বড় জটিল ব্যাপার। একে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা অতি বড় বিদ্ব্যানের পক্ষেও সম্ভব নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে ছোঁয়াচে রোগের সংস্পর্শে থাকলে রোগ সবসময় না হলেও তার কিছু কিছু লক্ষণ শরীরে দেখা দিতে বাধ্য।"

এতটা পথ গুরুদেবের হাঁটতে কষ্ট হবে বলে সদরে যাওয়ার ভোরের গরুর গাড়িতে এসে মেঠো পথের ধারে নামল গুরুদেব আর দ্বিবেদী মশাই। সূর্য তখনও পুরোপুরি ওঠেনি। আজ মেঘ আছে, কাজেই দিনের আলো ফুটতে দেরি হবে। গাড়ির ছৈয়ের মধ্যে বসে গুরুদেব আপন মনেই দ্বিবেদী মশাইকে অনেক কথা বললেন। শ্মশানে ঢোকার আগে হঠাৎ করেই গুরুদেব আত্মিক যোগের কথা তুললেন। দ্বিবেদী মশাই জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু আমি তো কাল কিছু অনুভব করিনি।"

— "রুগি যদি সব অনুভব করতে পারত তাহলে কি বৈদ্যর দরকার হত?"

বাকি রাস্তাটা কেউই কোনও কথা বললেন না। একটা ছোট ঢিবি পার হতেই জঙ্গলে ঘেরা থমথমে স্যাঁতস্যাঁতে শ্মশানটা সামনে দেখা গেল। মেঘের ধূসর আলোয় ছোট্ট টিনের চাল দেওয়া পাথরের মন্দিরটা অন্ধকারে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলাতেও শ্মশান জুড়ে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। গুরুদেব শ্মশানের চৌহদ্দিতে ঢোকার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

— "কী ব্যাপার গুরুদেব?" দ্বিবেদী মশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

— "বর্ষার মাসে আর্দ্র দক্ষিণা বাতাস বইছে গোটা প্রান্তরে, অথচ এখানে হঠাৎ গরম বাতাসের ভাপ এল কীভাবে?"

গুরুদেবের চোখ ঘুরে চলেছে গোটা শ্মশান জুড়ে। দ্বিবেদী মশাই তাকিয়ে দেখলেন চিতাকুণ্ডের কাছে জনা ছয়েক জড়ো হয়েছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে বুঝলেন কিছুক্ষণ আগে হয়তো কাউকে দাহ করা হয়েছে। চিতা নেভেনি তখনও।

— "হয়তো চিতা জ্বলছে বলে তার গরম বাতাস এসে লেগেছে আপনার গায়ে।"

ঘাড় নাড়লেন গুরুদেব। মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে কিছু একটা বিড়বিড় করতে করতে শ্মশানের চৌহদ্দির ভেতর পা রাখলেন। আজ যেন কেমন একটা দম বন্ধ আবাহাওয়া। মেঘ রোজ করে, কিন্তু এমন থমথমে দম আটকে আসা অনুভুতি তো কোনদিন হয় না। মন্দিরের মুখোমুখি একশো মিটার দূরে ঢালু হয়ে একটা পাথুরে টিলার নিচে প্রকাণ্ড নিমগাছটা আজ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'জনে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। গাছটার গুঁড়িটা এবড়ো খেবড়ো হয়ে এঁকেবেঁকে সোজা উঠে গেছে প্রায় তিরিশ ফুট। গাছটার সামনে দাঁড়িয়েই গুরুদেবের ঘন ভুরু দুটো হঠাৎ কুঁচকে গেল।

— "কী হোল গুরুদেব?" প্রশ্ন করলেন দ্বিবেদী মশাই।

— "সেই গরম হাওয়া!" তারপর দ্বিবেদী মশাইয়ের দিকে ঘুরে হঠাৎ গলা চড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তুই দূরে থাক... কাছে আসবি না গাছের! দূরে থাক! আরো দূরে যা!"

হকচকিয়ে দ্বিবেদী মশাই পেছনে সরে এলেন।

গুরুদেব খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন গাছের সামনে। তারপর ঝোলার ভেতর থেকে একটা ছোট শিশি বের করে সাদা চকের গুঁড়োর মতো দেখতে কোনও পদার্থ গুড়ির চারপাশে ছড়িয়ে গণ্ডি কেটে দিলেন।

তারপর ফিসফিস করে বললেন, "যদি তুমি কোনও অতৃপ্ত আত্মা হও, বা বিদেহী সত্ত্বা হও, যে কষ্টে রয়েছে, মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে, তাহলে

আভাষ দাও।"

চারিদিক চুপচাপ। গাছের পাতায় পাতায় ঝিঁঝিঁর ডাক, চিতার শেষ কাঠের টুকরো পোড়ানো আগুনের ক্ষীণ শব্দ, দূরে নদীর ঢেউয়ের মৃদু কলকল... এছাড়া কোনও শব্দ কানে এল না।

গুরুদেব খানিকক্ষণ গাছের দিকে তাকিয়ে থেকে এক-পা এক-পা করে পেছনে চলে এলেন। নিমগাছ যেমন ছিল তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

— "যদি আভাষ পাওয়া যায়, কীভাবে আমরা তা বুঝব?" গুরুদেবকে প্রশ্ন করলেন দ্বিবেদী মশাই।

— "এই সাদা বিভূতির গণ্ডি রক্তবর্ণ ধারণ করবে।" গুরুদেব গাছের দিক থেকে নজর না সরিয়েই বললেন।

স্তব্ধতার মধ্যে আর কিছু মুহূর্ত কাটার পর গুরুদেব নজর সরিয়ে নিলেন গাছের থেকে।

ইতিমধ্যেই চিতাকুণ্ডের দাহকর্ম সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। শ্মশানযাত্রীরা চিতায় জল ঢেলে ফিরে যাচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন বোধহয় ব্রাহ্মণ। শ্মশানযাত্রীদের সাথেই এসেছিল। বাকিরা এগিয়ে গেলেও, সে গর্ভগৃহের চৌকাঠের ভেতর ঢুকে হাত জোর করে প্রার্থনা করতে লাগল।

"নাহ, ভুল ভেবেছিলাম। গলদটা অন্য কোথাও।" গুরুদেব মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। দ্বিবেদী মশাই আরেকবার বিভূতির গণ্ডীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু যদি বিভূতির ভেতর কোনও —"

হঠাৎ দ্বিবেদী মশাইয়ের মুখের ভাষা মুখেই আটকে গেল!

সাদা গুঁড়ো দিয়ে আঁকা গণ্ডিটা রং বদলাতে শুরু করেছে। তবে লাল নয়। গাঢ় হতে হতে ধীরে ধীরে কুচকুচে কালো রঙের হয়ে গেল! যেন গাছের চারপাশে কেউ আলকাতরা দিয়ে বলয় টেনে দিয়েছে...

"গু-গুরুদেব"

প্রায় সাথে সাথেই নিমগাছটা ভয়ংকর ভাবে দুলে উঠল! যেন এক্ষুনি দ্বিবেদী মশাই আর গুরুদেবের ঘাড়ে আছড়ে পড়বে। দ্বিবেদী মশাই গুরদেবকে জাপটে ধরে ছিটকে দু'হাত দূরে গিয়ে পড়ার সাথে সাথে

দু'জনের নজর গেল মন্দিরের গর্ভগৃহে। যেই ব্যক্তি ঠাকুর প্রণাম করতে ভেতরে ঢুকেছিল সে মেঝেতে বসে পড়েছে আর দু'হাতে নিজের মাথাটা আঁকড়ে ধরে আর্তনাদ করে চলেছে।

বদলে গেল গুরুদেবের মুখের অভিব্যক্তি! অবিশ্বাসের সাথে আতঙ্ক এসে মিশল সেই চাহনিতে!

হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন নিথর হয়ে গেল সেই ব্যক্তি। হাত দুটো মাথা থেকে নেমে ঝুলে পড়ল কোমরের দুদিকে। তারপর বেল ফাটার মতো বিকট একটা শব্দ করে মুণ্ডুটা ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল!

ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন দ্বিবেদী মশাই!

পাথরের মেঝেতে খুলির টুকরো আর রক্তমাখা ঘিলুর অংশ এসে পড়তেই মুন্ডুবিহীন ধড়টা খানিকক্ষণ সেইভাবেই বসে রইল। তারপর ধড়াম করে এলিয়ে পড়ল মেঝেতে। হাত, পাগুলো কয়েক মুহূর্ত থরথরিয়ে কেঁপে আবার শান্ত হয়ে গেল।

দূরে কোথাও যেন একটা কোকিল অসময়ে ডেকে উঠল। হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন দ্বিবেদী মশাই। এত ভয় পেয়েছেন যেন মনে হচ্ছিল এক্ষুনি জ্ঞান হারাবেন। গুরুদেব তাঁকে কোনোরকমে জাপটে ধরে শান্ত করলেন। পেছনের নিমগাছটা ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে শান্ত হয়ে গেল। ঠিক আগের মতো...

দ্বিবেদী মশাইকে জড়িয়ে ধরে গুরুদেব নিজেও ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন। তাঁর মাথার মধ্যে অজস্র প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। তাহলে তিনি যা দেখেছিলেন তা সত্যি হোল! শুধু পবন দ্বিবেদীর বদলে এই ব্যক্তি।

স্বপ্নের মাধ্যমে কি ঈশ্বর তাঁকে বিপদের সংকেত দিতে চেয়েছিলেন? আজ মন্দিরে পবন দ্বিবেদী ঢুকলে তাঁর অবস্থাও নিশ্চয়ই ওই একই হত! গুরুদেব মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন কালচে বলয়ের দিকে। লাভ হোল না। বলয় আটকে রাখতে পারল না কেন? কী এমন শক্তি সে?

দ্বিবেদী মশাইয়ের চোখ আটকে রয়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহে পড়ে থাকা লাশটার দিকে। গুরুদেবের নিরাপদ আলিঙ্গনে থেকেও উনি ঠক্‌ঠক্ করে

কেঁপে যাচ্ছেন। আজ ওই লোকটার জায়গায় উনি নিজে থাকতে পারতেন! কিন্তু কেন? এত বছর ধরে তিনি ওই মন্দিরে অর্চনা করে গেছেন, হাজারে হাজারে মানুষ দাহ-সৎকার করে এই মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে গেছে। কী বদলে গেল? কোন অশুভের ছোঁয়ায় পবিত্র মন্দির ঘাতক রূপ নিল?

— "চলুন গুরুদেব। চলুন চলে যাই। আমি আর এখানে কখনও ফিরব না।" দ্বিবেদী মশাই গুরুদেবের হাত ঝাঁকিয়ে বললেন।

— "চলে যাওয়াটাই যদি লক্ষ্য হত তাহলে কনখল থেকে মাধবগড় আমি আসতাম না। তুই চাইলে আমি ফিরে যেতেই পারি আশ্রমে। কিন্তু মনে রাখবি, এখানে যা কিছুই অশুচি থেকে থাকুক তার অংশ তোর সাথেও জুড়ে রয়েছে! তার প্রমাণ আমি একাধিকবার পেয়েছি। অষ্টগ্রহ সমন্বয়ের সময় তুই এমন কিছুর সংস্পর্শে এসে পড়েছিলি যা প্রচণ্ড শক্তিশালী আর ভয়ংকর রকম অপবিত্র! তোর রাশি হালকা, তার সাথে গ্রহদশা এতটা অশুভ। দুইয়ে মিলে সেই প্রভাব তোর ওপর পড়েছে। পাতালের দাবাগ্নির তাপ আমি এখানে পা দিয়েই পেয়েছিলাম। আমি কোনও ওঝা গুণিন নই পবন, না আমার অলৌকিক কোনও ক্ষমতা আছে। এই পৃথিবীতে যে মনুষ্যজনিতে জন্মেছে সে কোনোদিন এই দাবি করতে পারে না যে ঈশ্বর তাঁকে এমন কোনও ক্ষমতা দিয়েছেন যা তিনি অন্যদের দেননি। ঈশ্বর সকলের মধ্যে আছেন। তোর মধ্যেও, আমার মধ্যেও... আমি শুধু নিজেকে চিনতে শিখেছি তোর থেকে একটু ভালোভাবে। ঠিক যেমন সূর্যরশ্মির সাতটা রঙের বেশি রং আমাদের চোখে ধরা দেয় না, বাদুড়ের ডাক আমাদের কানের পর্দা স্পর্শ করে না, তেমনই সব প্রভাব আমরা আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারব এমনটা নাও হতে পারে। ঠিক যেমন ধর্মীয় মতের সাধন সবসময় সব শক্তির ক্ষেত্রে নাও খাটতে পারে। যেমন আজ এই ভূতনাথ যজ্ঞের বিভূতি অক্ষম হোল। প্রাণ দিল নিরীহ মানুষটা..."

— "তাহলে আমাদের এখন কী করণীয়?" দ্বিবেদী মশাই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

— "গ্রামে ফিরে কাউকে বল থানায় খবর দিতে। এবেলা আমাদের এখানে

কোনও কাজ নেই। সূর্যাস্তের পর এখানে আবার ফিরব।”

“সূর্যাস্তের পর?” আঁতকে উঠলেন দ্বিবেদী মশাই।

গুরুদেব কথা না বাড়িয়ে গর্ভগৃহে পড়ে থাকা লাশটার দিকে শেষবার নজর দিয়ে হাঁটা লাগালেন। দুপুরের পর দ্বিবেদী মশাইয়ের দরজায় পুলিশের টোকা পড়ল। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে একই জায়গায় পর পর তিনটে ‘খুন’! এইবার জেরার হাত থেকে মুক্তি পেলেন না দ্বিবেদী মশাই। ওনাকে বাধ্য হয়েই বলতে হোল যে ওনার বয়সে কোনও মানুষের মুণ্ডু ওইভাবে ছাতু করে দেওয়ার মতো বিদ্যে বা ক্ষমতা কোনটাই ওনার নেই। যা হয়েছে ওনার নজরের অলক্ষে হয়েছে। উনি এও বললেন যে উনি নিজে দীর্ঘদিন ওই মন্দিরে পৌরোহিত্য করছেন এবং এর আগে এমন দুর্ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি ওই শ্মশানে।

দারোগাকে দেখে মনে হল ওনার কথা বিশ্বাস খুব একটা করেননি। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষ, তাই কিছুটা সহানুভূতির খাতিরেই তাৎক্ষণিক ভাবে জেরা থেকে মুক্তি দিলেন ওনাকে।

— “আপনার সুরক্ষার কথা ভেবেই বলছি। কয়েকদিন ওই মন্দির থেকে দূরে থাকলে বুদ্ধিমানের কাজ করবেন।” বলে নিজের জীপে উঠে চলে গেলেন দারোগাবাবু।

সকালের ওই দৃশ্য দেখার পর দুই বৃদ্ধের কারোরই খাওয়ার ইচ্ছে খুব একটা ছিল না, তবু নামমাত্র কিছু খেয়ে গুরুদেব চৌকিতে শুয়ে রইলেন। দ্বিবেদী মশাই চাটাই পেতে শুলেন মেঝেতে। চোখ জড়িয়ে এসেছিল গুরুদেবের, বোধহয় খানিক ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দে ঘুম ভাঙল।

একটা চাপা খ্যানখ্যানে কুৎসিত খিলখিলে হাসির আওয়াজ! চোখ খুলতেই গুরুদেব দেখলেন বাইরে সূর্যের আলো ঢলে গেছে। নিচে মুখ হাঁ করে দ্বিবেদী মশাই ঘুমোচ্ছেন।

তাহলে কি তাঁর মনের ভুল? এতটা ভুল শুনবেন উনি?

খুপরি জানলা দিয়ে পড়ন্ত বেলার একফালি লালচে আলো ঘুমন্ত দ্বিবেদী মশাইয়ের মুখে পড়ছে। হঠাৎ চোখ বন্ধ অবস্থাতেই দ্বিবেদী মশাইয়ের ঠোঁট

দুটো ফাঁক হয়ে গেল... খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন পবন দ্বিবেদী!

"পবন!" চেঁচিয়ে উঠলেন গুরুদেব।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন দ্বিবেদী মশাই। উদভ্রান্তের মতো কয়েক সেকেন্ড এদিক ওদিক তাকিয়ে গুরুদেবের দিকে তাকাতেই মুখের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক হোল...

— "ওহ! আপনি ঠিক আছেন? আমি ভাবলাম বুঝি..."

উত্তর দিলেন না গুরুদেব। গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন তাঁর পুত্রসম শিষ্যের মুখের দিকে। প্রভাব বাড়ছে! ক্ষণে ক্ষণে। তা তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর প্রতিকার করতে হবে। কিন্তু নিজের মনে সদাশিব চতুর্বেদী বেশ জানেন, এই অদ্ভুত বিপদের প্রতিকারের উপাচার তাঁর জানা নেই। যে শক্তিকে শনাক্ত করাই সম্ভব হয়নি, তার অসিদ্ধতা তিনি কীভাবে নিশ্চিত করবেন?

সূর্য ডোবার আগে দু'জনে বেড়িয়ে পড়লেন। লক্ষ্মণ গাড়োয়ানকে বলা ছিল, যথা সময় তার গরুর গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিল। ছৈয়ের মধ্যে বসে গুরুদেব চোখ বুজে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে রাখলেন। তিনি জানেন আজ তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হবে বুক ভরা সাহস!

শ্মশানের সামনে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন আকাশের গা থেকে সূর্যের শেষ আলোটুকুও প্রায় মুছে গেছে। শ্মশানে ঢোকার কোনও ফটক নেই। তবু গাছের গুঁড়ি ফেলে ঢোকার মুখটা আটকানো হয়েছে। সম্ভবত এটা পুলিশের কাজ। তিন-তিনটে দুর্ঘটনার পর তারা আপাতত শ্মশান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

— "এদিক দিয়ে গুরুদেব।" দ্বিবেদী মশাই পাশ কাটিয়ে দক্ষিণের দুটো ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁক দিয়ে গুরুদেবকে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

মন্দিরটা অন্ধকারে খাঁ খাঁ করছে। গর্ভগৃহের দুয়ার খোলা। অন্ধকারে মিশে গেছে ভেতরের কষ্টি পাথরের কালী মূর্তি। মেঘ করে এসেছে আকাশে, কিন্তু গুমোট একটা আবহাওয়া। কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে ফাঁকা চিতাকুণ্ডটা। কিছুটা ছাই পড়ে রয়েছে নিচে। কোনও ভস্মীভূত মানুষের দেহাবশেষ যে ক্ষণকাল

আগেও বেঁচে ছিল তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে আঁকড়ে ধরে।

— "এটায় কোনও লাভ হবে কিনা জানি না। তবু যদি কিছুটা কুপ্রভাব কমাতে পারে... বলতে বলতে গুরুদেব তাঁর শিশ্যের গলায় কাচের মতো স্বচ্ছ একটা মাদুলি পরিয়ে দিলেন। মাদুলি পরাতে গিয়ে গুরুদেবের ডান হাতের আঙুলগুলো দ্বিবেদী মশাইয়ের গলায় ঠেকল —

— "একি! তোর গা এত গরম হোল কী করে?"

গুরুদেব টর্চের আলো পবন দ্বিবেদীর মুখে ফেললেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্বিবেদী মশাই। টর্চের আলোয় চোখদুটো একটু কুঁচকে গেছে ঠিকই কিন্তু ওনার চোখের মণিদুটো তো এতটা ছোট নয়। চোখদুটো যেন কোঠরের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে!

— "পবন?"

দাঁড়িয়ে আছেন দ্বিবেদী মশাই নিম গাছটার দিকে পিঠ করে। তাঁর পেছনের অন্ধকারে কিছু একটা নড়ছে! কারোর মাথার লম্বা চুল! এক গোছা উড়ন্ত চুল সমেত একটা মহিলার ফ্যাকাসে মুখ হঠাৎ উঠে এল দ্বিবেদী মশাইয়ের কাঁধের পাশ দিয়ে!

— "সরে যা!"

এক ধাক্কা মেরে গুরুদেব দ্বিবেদী মশাইকে মাটির ওপর ছিটকে ফেলে দিলেন। নড়ে উঠেছে নিমগাছটা! যেন রক্তের গন্ধ পাওয়া কোনও হিংস্র জানোয়ার ঘুম থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল শিকারের নেশায়!

থরথরিয়ে কেঁপে উঠলেন গুরুদেব! অন্ধকার ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসা সেই মুখ... অত বীভৎস মুখ তিনি এর আগে কখনও দেখেননি। এক ঝলক দেখলেও সেই খুনে চাহনি তাঁর সর্বাঙ্গ আতঙ্কে জমিয়ে দিয়েছে!

নিমগাছটার ডালপালাগুলো কেমন অদ্ভুতভাবে নড়াচড়া করছে... ঝড়ে তো এমন হয় না! একেকটা ডাল তো একেক দিকে দোল খায় না!

গুরুদেব নিজের বুকে হাত দিয়ে চিৎকার করে ভূতনাথ মন্ত্র জপ আরম্ভ করলেন। মন্ত্রের দাপটে যেন প্রলয় ঘটে গেল গোটা শ্মশান জুড়ে! গাছটা প্রবলভাবে দুলে উঠল!

— "কে তুমি! কি চাও? আত্মা? প্রেত? যক্ষ? রক্ষ? অপদেবতা? উপদেবতা? কে?"

হঠাৎ যেন সব কিছু শান্ত হয়ে গেল। গাছ দুলতে দুলতে থেমে গেল। জঙ্গলে ঘেরা জনমানবহীন শ্মশানে শুধুই ঝিঁঝিঁর ডাক। দূরে কোথাও গুমরে উঠল মেঘ...

নৈশব্দ চিড়ে একটা গা শিরশিরে শব্দ শুনতে পেলেন গুরুদেব... খিলখিলে ঠান্ডা উঁচুস্বরের হাসির শব্দ! ঠিক যেমন আজ দুপুরে শুনেছিলেন! শব্দটা আসছে ওনার পেছন থেকে।

ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেল গুরুদেবের। সন্তর্পণে ঘুরলেন পেছন দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছেন পবন দ্বিবেদী, মুখটা এতটা বড় হাঁ করে হাসছেন... এত বড় হাঁ কোনও মানুষের হওয়ার কথা নয়। যেন কেউ ঠোঁটের দু দিকটা ধরে চিড়ে মুখের আয়তন সরীসৃপের মতো বড় করে দিয়েছে।

হাত পা জমে গেল সদাশিব চতুর্বেদীর! এতদিনের বিদ্যা যেন এক লহমায় মাথার ভেতর থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল! এ কি হল তাঁর শিষ্যের!

হাসি থামালেন পবন দ্বিবেদী। তাঁর শরীরে যেন কোনও হাড় নেই, এমন ভয়ংকর ভাবে বেঁকছে তাঁর অঙ্গগুলো!

"আমি সে, যে তোদের জগৎ থেকে অনেক দূরে চলে গেছি!" পবন দ্বিবেদীর মুখ দিয়ে এক উঁচু ভাঙা গলায় প্রায় হাওয়ার মতো আওয়াজ বেরোল। তাঁর শরীরটা হঠাৎ দুমড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। গুরুদেব জানতেন আজকের রাত সহজ হবে না। সাহস আর স্নায়ু, এই দুটো জিনিস গুরুত্ব রাখবে খুব বেশি। কিন্তু তিনি ভাবেননি আক্রমণটা পবন দ্বিবেদীর ওপর হবে এতটা বেশি।

গুরুদেব নড়লেন না নিজের জায়গা থেকে। একভাবে পবন দ্বিবেদীর সঙ্কুচিত চোখের তারার দিকে তাকিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করলেন, "তুমি যেই হও। আমরা তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। এখানে কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করেনি। তাহলে তুমি কেন নিরীহ মানুষের প্রাণ নিচ্ছ?"

হঠাৎ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন দ্বিবেদী মশাই। খানিকক্ষণ স্থিরভাবে

তাকিয়ে রইলেন গুরুদেবের চোখের দিকে। তাঁর চোখের মণিদুটো যেন আরও ছোট হয়ে গেছে! হঠাৎ আবার সেই হাসি... খ্যানখ্যানে, উঁচু, ঠান্ডা, দেহের রক্ত জমিয়ে দেওয়ার মতো নোংরা পৈশাচিক অট্টহাস্য।

— "নিরীহ? মানুষ? নিরীহ তো আমার বাচ্চাটাও ছিল যখন তোমরা গিয়ে ওকে ধরেছিলে। তোমাদের এই মা! যাকে তোমরা ঈশ্বর ভাবো, সে একবারও ভাবেনি এই মায়ের কথা!" নিজের বুক থাবড়ে চিৎকার করে উঠলেন পবন দ্বিবেদী। তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে থাকল গাছের ডালে ডালে!

গুরুদেব নড়লেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন... হঠাৎ যেন তাঁর মনে হল এটা পৈশাচিক আস্ফালন নয়... যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ!

— "যে আরেক মায়ের বুক ফাটিয়ে তার সন্তানের রক্তে তেষ্টা মেটাতে পারে, তার মাতৃরূপে পূজা পাওয়ার কোনও অধিকার নেই!" পবন দ্বিবেদী কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো বললেন। তারপর হঠাৎ এলিয়ে পড়লেন মাটির ওপর। সাথে সাথে যেন গুরুদেবের চারপাশে কুয়াশা ঘিরে এল। গুরুদেবের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল...

চোখ কচলে যখন মুখ তুলে তাকালেন, দেখলেন শ্মশানের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তার সামনে মন্দিরটা এখনও আছে, কিন্তু তাতে প্রদীপ জ্বলছে... আর গর্ভগৃহে ওটা পবন না? দিনের পূজার শেষে নিজের থলে গুছোচ্ছে সে। হয়তো এবার বাড়ি যাবে।

দু'জন লোককে দেখা গেল। একজনের কোলে একটা প্রায় অচৈতন্য বাচ্চা ছেলে। গুরুদেবের হাত পা যেন দেহের সাথে আটকে গেছে। নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়েছেন তিনি। পুরোহিতের সাথে ওই দুই ব্যক্তির বাকবিতণ্ডা চলছে। এতদূর থেকে তাদের কথা শোনা না গেলেও অঙ্গভঙ্গিতে বেশ আন্দাজ করা যায়।

হঠাৎ সামনের জন পবন দ্বিবেদীকে দিল এক মোক্ষম ধাক্কা। উনি ছিটকে পড়লেন, আর পেছনের ব্যক্তি ঝোলা থেকে টেনে বের করল একটা প্রায় দু'হাত লম্বা চকচকে ইস্পাতের খাঁড়া! মন্দির খুলে যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জ্বালানো হোল। বাচ্চাটিকে শোয়ানো হোল কুণ্ডের পাশে। পুরোহিতকে যেন জোর

করে মন্ত্রোচ্চারণ করানো হোল। কুণ্ডের আগুনে কালো দেবীমূর্তির রূপ যেন কয়েক গুণ ভয়াল হয়ে উঠেছে!

তারপর এক ধাক্কা মেরে পবন দ্বিবেদীকে মন্দিরের বাইরে বের করে দেওয়া হল। উনি পেছনদিকে না তাকিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে হারিয়ে গেলেন। গুরুদেবের বুকের ধুকপুকানি অনেকটা বেড়ে গেল যখন বাচ্চাটার মাথাটাকে কুণ্ডের বেদিতে রাখা হোল। খাড়াটা একবার দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে ওপর ধরে বাচ্চাটার শরীরের দুদিকে পা দিয়ে দাঁড়ালো দুই শয়তানের একজন। তারপর চিৎকার করে সেটাকে মাথার ওপরে তুলে সজোরে নামাল বাচ্চাটার ঘাড়ে!

আর্তনাদ করে চোখ বুজে নিলেন গুরুদেব! হঠাৎ যেন চারিদিক স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁর ডাকগুলোও আর শোনা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে চোখ খুললেন গুরুদেব। সন্ধের অন্ধকার গাঢ় হয়ে রাত নেমেছে শ্মশানে... মন্দিরটা আঁধারে ডুবে রয়েছে। যজ্ঞকুণ্ড অন্ধকার। কোথায় গেল মানুষগুলো? পালটে গেছে পুরো দৃশ্যপট।

কানে একটা শব্দ এল গুরুদেবের; টেনে টেনে নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ... যেন ঘায়েল বুকের শ্বাস ফেটে ফেটে বাইরে আসছে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে। এই একই কান্নার শব্দ তাঁর শিষ্যের গলা থেকে এর আগেও পেয়েছেন... ভালো করে লক্ষ্য করে গুরুদেব বুঝলেন মন্দিরের বারান্দায় স্তুপের মতো পড়ে রয়েছে এক মহিলা। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর... তার উথলে উথলে ওঠা বুকফাটা কান্নার শব্দ যেন সমস্ত শ্মশানভূমিকে আরও নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে। পাথরের কালীমূর্তি সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে... নিশ্চল, উদাসীন... নিষ্প্রাণ!

উঠে দাঁড়াল মহিলা। বাজের আলোয় গুরুদেব প্রথমবার তার মুখ দেখলেন। চোখ কোঠরে ঢুকে গেছে, চোখের জল শুকিয়ে গালে দাগ পড়ে গেছে... পরনে শতছিন্ন শাড়ি, চুল আলুথালু... তার হাতে ধরা একটা চপার গোছের লোহার ধারালো টুকরো। প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এসে দাঁড়ালো মন্দিরের মুখোমুখি নিমগাছটার তলায়। তার দৃষ্টি সোজা মন্দিরের

ভেতরের কালীমূর্তির দিকে।

"তুই মা হতে পারিস না।" তার গলার কান্নার রেশ কেটে গিয়ে ঝরে পড়ছে ঘেন্না আর রাগ! "শান্তি পেলি ওর রক্ত খেয়ে? মিটল তোর তেষ্টা? আমার ছেলেটাকে কারা এনেছে আমি জানি না... আমি শুধু জানি তারা তোর ওপর বিশ্বাস করে মেরেছে আমার ছেলেটাকে! যারা একাজ করল তাদের কেউ খুঁজে পেল না। পেল আমার ছেলেটার টুকরো হয়ে যাওয়া মাথাটা! এই নৃশংসতা যদি তোর পূজার প্রথা হয় তাহলে তোর পূজা পাওয়ার কোনও অধিকার নেই! ভগবান যদি তোর মতো হয় তাহলে আমি নিজেকে সঁপে দিলাম শয়তানকে! আমি চলে যাচ্ছি তার কাছে কিন্তু এই মন্দিরে যে তোর নাম নেবে, মন্ত্র পড়বে বা পূজা করতে যাবে তার মৃত্যু হবে ভয়ঙ্কর! আমার ছেলে যতটা কষ্ট পেয়ে শেষ হয়েছিল, তার থেকেও বেশি কষ্টের! তোর ঘোর বিরোধী শক্তি যদি জগতে কিছু থাকে, আজ থেকে আমি তার দাসী, তার কাছে আমি দিলাম নিজের বলিদান! আর আমার সমস্ত রাগ, ঘেন্না, কষ্ট আর চোখের জল আমি অঞ্জলী দিলাম তোর পায়ে!"

জঙ্গল কেঁপে উঠল বাজের আওয়াজে! মহিলা চপারটা নিয়ে নিজের গলায় বসিয়ে সজোরে মারল এক হ্যাঁচকা টান। মাংস কাটার একটা গা গুলিয়ে ওঠা শব্দের সাথে সাথে ফোয়ারার মতো ছিটকে বেরিয়ে এল টাটকা রক্ত, হাঁ হয়ে যাওয়া গলনালিটার ভেতর দিয়ে। কয়েক সেকেন্ড গলা ধরে ছটফট করল মহিলা। তারপর মাটিতে পড়ে দাপিয়ে উঠল শরীরটা। রক্তের ফোয়ারা ভিজিয়ে দিল নিমগাছটার গোড়া আর শেকড়। ধীরে ধীরে নেতিয়ে গেল মহিলার শরীর।

বৃষ্টি নামলো শ্মশানে।

গুরুদেব পাথরের মতো তাকিয়ে রইলেন নিমগাছটার গোড়ায়। সেখানে এখন কিছুই নেই... কুয়াশা কেটে গেছে শ্মশানে... পেছনে ঘুরে দেখলেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে পবন দ্বিবেদী। হাতে পায়ে জোর পেলেন গুরুদেব। ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। শরীরে হাত দিয়ে বুঝলেন শ্বাস পড়ছে তাঁর কিন্তু চেতনা নেই।

ভিজে মাটির ওপর বসে পড়লেন গুরুদেব। এক অসহায় মায়ের শেষ সম্বলকে দেবীর ভোগে চরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জিঘাংসা জন্ম দিয়েছে এমন এক শক্তির যা শয়তানের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। মৃত্যুর যন্ত্রণার সাথে জুড়েছে পরমাত্মার প্রতি ঘেন্না, আর শয়তানের প্রতি আনুগত্য... সব মিলে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অপদেবী যে নিজের কষ্টে মলম লাগাতে মেতে উঠেছে এই মারাত্মক মারণ খেলায়। না, এক সন্তানহারা মায়ের ওপর তাঁর সহানুভূতি আছে বৈকি কিন্তু যেই পিশাচী রক্তের খেলায় মেতে উঠেছে, তাকে কিছুতেই এই হত্যালীলা চালাতে দেওয়া যায় না। আজ অষ্টগ্রহ সমন্বয়ের অমাবস্যা। আজ দুই জগতের দুয়ার সবচেয়ে ভেদ্য। কাল সকালের মধ্যে অমাবস্যা ছেড়ে যাবে। যা কিছু করতে হবে আজ রাতেই।

উঠে দাঁড়ালেন আচার্য্য সদাশিব চতুর্বেদী। বৃষ্টি এখনও নামেনি। চিতাকুণ্ডের কাছে রাখা কাঠের স্তূপ কিছুটা এনে রাখলেন নিমগাছটার গোড়ায়। বার্ধক্যের ফলে হাড়ের জোর কমে গেছে তাই একটা-দুটো করে কাঠের টুকরো গোল করে সাজালেন শেকড়গুলোকে ঘিরে। তারপর মন্দিরের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন। পবিত্রতা বা কোনোরকম ঐশ্বরিক উপাচার এর বিরুদ্ধে কাজ করবে না। বরং যেকোনো ধরনের শুদ্ধাচার এই পিশাচীর শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। এই মন্দিরের মাথা কুটে নিজেকে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করেছে এই মহিলা। অপবিত্র হয়ে গেছে এই মন্দির। সেখানে শুদ্ধাচার করা মানে তাকে আরও শক্তি জোগানো। যেই কারণেই ভূতনাথ এর বিভূতি কোনও কাজ করেনি আজ সকালে। যে নিজে বিদেহী আত্মা হওয়ার উর্ধ্বে গিয়ে অপদেবীর পর্যায়ে চলে গেছে তাকে গণ্ডী দেওয়া শুধু কঠিন নয়। প্রায় অসম্ভব।

গর্ভগৃহে ঢোকার আগে পায়ের জুতোটা খুলতে গিয়েও খুললেন না গুরুদেব। তারপর এদিক ওদিক হাতড়ে ঘিয়ের একটা ছোট ঘড়া বের করে এনে কিছুটা ঢেলে দিলেন কাঠের টুকরোগুলো আর গাছের গুঁড়ির ওপর। তারপর আগুন লাগিয়ে দিলেন কাঠের গায়ে। আগুনের শিখা গাছের গুঁড়ি স্পর্শ করতেই যেন পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল গুরুদেবের! শ্মশান কাঁপানো চিৎকারের সাথে সাথে দুলে উঠল নিমগাছটা! হঠাৎ একটা নিচু ডাল

হাওয়ার ঝাপটার মতো সপাটে এসে মারল গুরুদেবের বাঁ দিকের পাঁজরে! দুর্বল শরীরটা ছিটকে গিয়ে পড়ল প্রায় মন্দিরের বারান্দার কাছে। হাতে ধরা ঘি-এর ঘড়াটা ফেটে গিয়ে চলকে ভিজিয়ে দিল গুরুদেবের সারা গা। কাঁধের ঝোলাটা ছিটকে পড়ে তার ভেতর থেকে বিভূতির শিশিটা খুলে গিয়ে চকের মতো বিভূতির গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল বারান্দার সামনে।

মাটিতে পড়েই গুরুদেব বুঝতে পারলেন বুকের বাঁ পাশটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। সেই সাথে কঠিন হয়ে উঠছে শ্বাস নেওয়া! ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন আঘাতের জায়গাটাকে। জোর করে দম টানতে দিয়ে কাশতে লাগলেন গুরুদেব। মুখটা নোনতা ঠেকতেই বুঝতে পারলেন মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এসেছে!

গাছের তলার কাঠগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে নিভে গেছে আগুন। শরীর ছেড়ে দিল গুরুদেবের। চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন মাটিতে। অসহ্য যন্ত্রণায় কোমরটা নাড়াতে গিয়েও পারলেন না।

— "আমি অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছি!"

আবার সেই উঁচু ঠান্ডা ফ্যাসফ্যাসে গলার স্বর! গুরুদেব মুখ তুলে দেখলেন নিমগাছটার উঁচু একটা ডালের ওপর গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে আবছা এক নারীমূর্তি! ফ্যাকাসে রক্তশূন্য মুখটা চিনতে পারলেন তিনি।

— "এবার শেষ হবি তুই!"

খিলখিল করে হেসে উঠল সেই নারীমূর্তি! গুরুদেব প্রাণপণ চেষ্টা করলেন টেনে শ্বাস নেওয়ার, কিন্তু ফুসফুস যেন মানতেই চাইল না। গলা বুজে আসছে রক্তের স্রোতে। সম্ভবত হৃৎপিণ্ড ফাটিয়ে ফেলেছে ওই মোটা ডালের সপাটে বাড়ি! চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও দেখতে পেলেন সেই আবছা পিশাচী অবয়বকে। দোদুল্যমান গাছের নিচে নিথর হয়ে পড়ে আছে তাঁর শিষ্য...

হঠাৎ যেন জেদ চেপে গেল গুরুদেবের! না... এই অপদেবী কিছুতেই জিতবে না। তাঁর প্রাণ গেলেও নয়। এই মন্দির না থাকে তো না থাকুক কিন্তু একজন শিশুর প্রাণের দাম কখনই তিনি অন্য নির্দোষেদের প্রাণ দিয়ে চোকাতে দেবেন না!

মন্দিরের বারান্দায় পড়ে থাকা বিভূতির দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়তে শুরু করলেন ভূতনাথ মন্ত্র! যেন ঝড় উঠল শ্মশানে! আকাশ কাঁপিয়ে হেসে উঠল গাছের ডালে ঝুলে থাকা অবয়বটি! যেন সদাশিব চতুর্বেদীর নির্বুদ্ধিতায় উপহাস করতে লাগল সে! ডালপালা ফুলিয়ে ফুঁসে উঠল নিমগাছটা!

"আভাষ দাও!" মাটিতে ছড়িয়ে থাকা বিভূতির দিকে তাকিয়ে চিঁ চিঁ করে বললেন গুরুদেব। "যেই থাকো ওখানে, আভাষ দাও। দুয়ার খুলে দিয়েছি তোমার জন্য। আজ রাতেই সুযোগ... আভাষ দাও!"

পড়ে থাকা সাদা বিভূতির গুঁড়ো হঠাৎ একটু একটু করে রং বদলাতে শুরু করল! সাদা থেকে গোলাপি, তারপর দেখতে দেখতে টকটকে লাল! ঝড়ের হাওয়ায় ধুলো উড়িয়ে মেঘের মতো ঘিরে দিল চারিদিক... হাওয়ার শব্দে কান পাতা দায়!

— "মা!"

হঠাৎ যেন সব শব্দ একসাথে থেমে গেল। থেমে গেল অট্টহাসি। শান্ত হোল ঝড়। গুরুদেব কি ঠিক শুনলেন? কচি স্বরে একটা করুণ ডাক...

— "মা গো!"

ধুলোর মেঘ সরতেই দেখা গেল মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ছোট্ট বছর আটেকের ছেলে। তার শরীরটা যেন একটু অস্পষ্ট, একটু ঝাপসা... কিন্তু মুখে চোখে অদ্ভুত লাবণ্য। টলটলে চোখদুটোতে যেন কত ব্যথা লুকিয়ে।

তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে আরেটি ছায়ামূর্তি। চিনতে পারলেন গুরুদেব। কাল এই প্রণাম করতে ঢুকেছিল মন্দিরের ভেতরে...

হঠাৎ যেন নিস্তব্ধতা গ্রাস করল গোটা শ্মশান প্রান্তরকে। থেমে গেল নিমগাছের দুলুনি। গুরুদেব ঘুরে তাকালেন গাছের ডালের দিকে। না কেউ নেই সেখানে। সেই মহিলার অবয়বটি নিচে নেমে এসেছে। গাছের গোড়ায়। ঠিক যেখানে তার লাশ পাওয়া গেছিল। ফ্যাকাসে নিষ্প্রাণ মুখটায় হঠাৎ পরিবর্তন এসেছে। কুটিল পিশাচী যেন আরও একবার মাতৃত্বের স্বাদ পেল ছেলের 'মা' ডাকে।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে এক ভাবে। তার দৃষ্টি আবছায়া মায়ের অবয়বের দিকে। সে আবার মাকে ডাকল।

মহিলার অবয়ব যেন হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠল। এদিক ওদিক দেখতে থাকল, যেন কিছু খুঁজছে সে। প্রবল আগ্রহে, চরম উৎসাহে। কিন্তু যা খুঁজছে তা পাচ্ছে না। হঠাৎ তার অশরীরী বুক চিড়ে হাহাকার বেড়িয়ে এসে চিড়ে দিল রাতের নিস্তব্ধতা।

— "তাকে তুমি দেখতে পাবে না।"

গুরুদেব মাথাটা সামান্য তুলে বললেন, "কারণ সে আর তুমি পরজগতের এক স্তরে নেই। তুমি স্বেচ্ছায় নরকে গমন করেছ। নিজের জন্য পাপের এই রাস্তা বেছে নিয়েছ। তাই সে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো না। তাই মৃত্যুর পরও তুমি তার সাথে মিলিত হতে পারোনি।"

আস্ফালন ভুলে আর্তনাদ করে উঠল পিশাচী! তাঁর ফ্যাকাসে মুখ কুঁকড়ে গেল যন্ত্রণায়।

— "আমি চাই না এভাবে থাকতে। যেভাবে হোক আমার ছেলের কাছে ফিরিয়ে দাও আমায়। তাঁর ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি কিন্তু বাছাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি আমায় ফিরিয়ে দাও তার কাছে। মুক্তি দাও আমায়।"

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে গুরুদেবের। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর সময় প্রায় শেষ। ছেলেটার মুখে দিকে তাকালেন একবার। কি করুণ সেই মুখ। সে তার মাকে দেখতে পাচ্ছে কিনা জানা নেই। কিন্তু এই অবস্থায় তার মাকে সে নিশ্চয়ই কখনও দেখতে চায়নি।

— "মুক্তি তুমি পাবে না। মুক্তি তার হয় যে ইহলোক আর পরলোকের মাঝে আটকে আছে। তুমি স্বেচ্ছায় শয়তানের পথ বেছে নিয়েছ। কিন্তু তোমার মাতৃত্বের মর্যাদা আমি রাখব। আমার সময় সীমিত। তোমরা দু'জনে আমায় আধার বানিয়ে মিলিত হও। আমার আত্মার মাধ্যমে তোমরা স্পর্শ পাবে একে ওপরের। কেউ জানবে না। আমি চলে গেলে আমার শরীর এই শ্মশানেই বিলীন করে দিও। যাতে তা কোনোরকম ধর্মীয় প্রণালির স্পর্শে না আসে। যাতে আমার আত্মার মুক্তির ব্যবস্থা কেউ না করতে পারে। তোমরা মা-সন্তান

আমার বিদেহী আত্মাকে জড়িয়ে এক হয়ে থেকো...

হঠাৎ থেমে গেল গুরুদেবের কথা। কাশতে আরম্ভ করলেন তিনি। মুখের কষ গড়িয়ে রক্তের ধারা ঝরে পড়ল। শেষবারের মতো মহিলার অবয়বের দিকে তাকিয়ে হালকা করে ঘাড় নাড়লেন তিনি। চোখের পলকে পর পর দু'বার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল মাটিতে পড়ে থাকা গুরুদেবের শরীরটা। তারপর এক ঝটকায় ছিটকে উড়ে গিয়ে পড়লেন একেবারে চিতাকুণ্ডের মধ্যে! চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে উনি অনুভব করলেন, যেন ওনার মাথার ভেতর একসাথে দুটো গলার স্বর শুনতে পাচ্ছেন উনি। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে যেন শুনতে পেলেন একসাথে দুটো কান্নার শব্দ... মা ও ছেলের... সে কান্না কষ্টের নয়। পুনর্মিলনের...

নিথর হয়ে গেল আচার্য্য সদাশিব চতুর্বেদীর শরীর। সুনসান শ্মশানের চিতাকুণ্ডের ভেতর খানিকক্ষণ পড়ে রইল নিষ্প্রাণ মহাত্মার নিথর দেহ। তারপর বাজ পড়ল মাথার ওপরের জামগাছটার ডালে। আগুন ধরে গেল তাতে। জ্বলন্ত এক টুকরো শুকনো পাতা এসে গুরুদেবের ঘি-এ ভেজা কুর্তাতে স্পর্শ করতেই অল্প অল্প করে আগুন গ্রাস করে নিল বৃদ্ধের শরীর। নিঃসঙ্গ অগ্নিশয্যায় ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেলেন গুরুদেব।

* * * * * * * * * *

দ্বিবেদী মশাইয়ের যখন জ্ঞান ফিরল তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট হতেই ধীরে ধীরে উঠে বসলেন তিনি। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে খেয়াল হল তিনি কোথায় আছেন... মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! কিন্তু এই শেষ রাত্রে তিনি এখানে এসে পড়ে রইলেন কীভাবে? কাল রাতে কি তাহলে তিনি বাড়ি ফেরেননি? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না গত কয়েকদিনের ঘটনা। মনে হল যেন গুরুদেব এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে। সব যেন কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। তারপর মনে হল... নাহ... ওনার সাথে দীর্ঘদিন সম্পর্ক নেই... উনি কীভাবেই বা আসবেন? হয়তো গুরুদেবের স্বপ্ন দেখেছিলেন... নিজের মনকে বোঝালেন দ্বিবেদী মশাই;

সম্ভবত কাল সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরতে গিয়ে কোনও কারণে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন উনি... নাহ, প্রেশারটা একবার দেখাতে হচ্ছে।

পূবের আকাশ লাল হয়ে আসছে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন দ্বিবেদী মশাই। মাথার যন্ত্রণাটা কমবার নাম নেই। পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে মন্দিরের বারান্দায় গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে রাখলেন। আষাঢ় মাস হলেও ভ্যাপসা গরমের অনুভূতি হচ্ছে।

বেশ কয়েকবার ডুব দিয়ে শিপ্রা নদীতে স্নান করলেন। উঠে গা মুছতেই অনেকটা সুস্থ বোধ হল। হাতের ঘটিটায় নদীর জল ভরলেন। তারপর ঘাটে উঠে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চিতাকুণ্ডের তলায় একরাশ ছাই থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। দ্বিবেদী মশাই মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয়ই কাল রাতে কাউকে দাহ করা হয়েছে। শবযাত্রীদের এত তাড়া যে চিতা পুরোপুরি নেভার আগেই তারা স্থানত্যাগ করেছে।

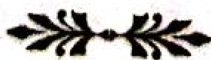
রোজকার স্বভাব মতো হাতের ঘটি থেকে অঞ্জলিতে করে জল নিয়ে নারায়ণের নাম নিয়ে শান্তি মন্ত্র জপতে জপতে উনি ছেটালেন ছাইয়ের ওপর।

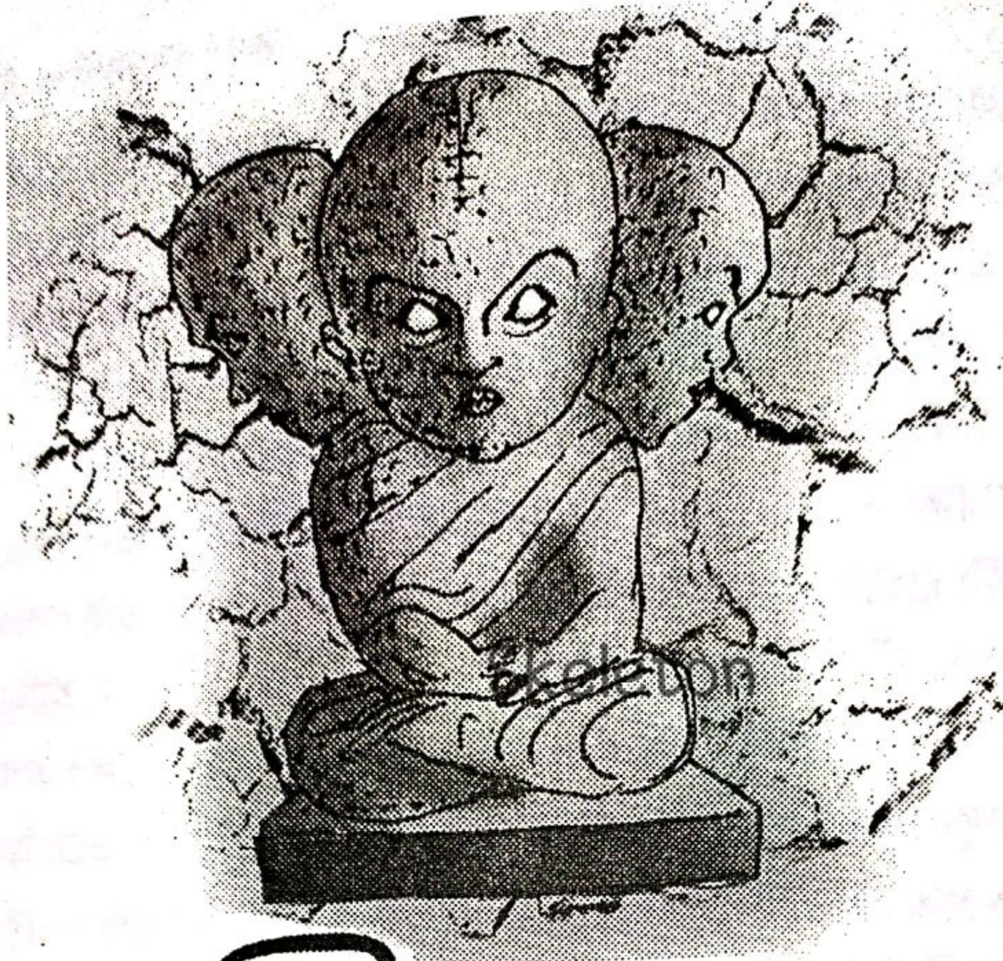
— "ওম শান্তি! ওম শান্তি! ওম শান্তি!"

এই ভোরের বেলাতেও দূরে কোথাও কর্কশ শব্দে একটা শেয়াল ডেকে উঠল।

"হে ঈশ্বর!" হঠাৎ আঁতকে উঠলেন দ্বিবেদী মশাই। চিতাকুণ্ডের ছাই শান্তির জলের স্পর্শ পাওয়ামাত্র টগবগ করে লাভার মতো ফুটতে আরম্ভ করেছে! হঠাৎ গল গল করে এক রাশ কালো ধোঁয়া ছিটকে বেড়িয়ে গেল সেই ছাইয়ের গাদার মধ্যে থেকে।

মড় মড় শব্দ কানে যেতেই পেছন ফিরলেন দ্বিবেদী মশাই। আর বিস্ফারিত চোখে দেখলেন আঁধার ঘেরা মায়াবী ভোরের আলোয় দুলে উঠেছে মন্দিরের সামনের প্রকাণ্ড নিমগাছটা।





ত্রিদেব

— "তিন কাল। তিন বিস্তার। তিন জগৎ। ঠিক যেমন দুই-এর মিলন সৃষ্টির আধার, তেমনি তিন-এর মিলন আনে ধ্বংস! দুই নদীর সঙ্গমে বাড়ে মাটির উর্বরতা, তিন নদীর সঙ্গম জন্ম দেয় প্লাবনের! দুই মনের মিলনে গড়ে পরিবার, তিনের মিলনে ছারখার হয় সংসার! সূর্য চন্দ্রের স্বাভাবিক গতির মধ্যে যখন পৃথিবী এসে পড়ে তখন এই তিনের মিলনে লেগে যায় গ্রহণ!

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত লুসিফার নরকে নিজের অধিষ্ঠান বানানোর পর চয়ন করে তিন দূতকে। 'সেথ' দ্বায়িত্ব পায় নরকের। 'কিয়া'কে দায়িত্ব দেওয়া হয় মনুষ্যলোকের। আর স্বর্গের দ্বায়িত্ব পায় এদের মধ্যে সবচেয়ে কুটিল দেবদূত-এর বেশধারি শয়তানের সেবক 'রোয়ান'! লুসিফার তাদের প্রশংসা করে বলে, তাদের ঐক্যতাই তাদের সবচেয়ে বড় বল। কিন্তু তিনটি আলাদা জগতে বিভক্ত থাকার জন্য তারা মিলিত হতে পারবে না। এই তিন জগৎ

থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু কখনও যদি তাদের নিজেদের বিস্তার ও জগৎ থেকে তারা একই সময়ে একই কারণে মুক্তি পায়, তাহলে তারা মিলিত হবে এমন এক অপশক্তি রূপে যা গোটা সৃষ্টিকে পাপের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে পারে।”

'উজি শুই মোনোগাতারী (Uji Shui Monogatari)' নামক জাপানী উপকথার ইংরিজি সংস্করণটা সশব্দে কোলের ওপর বন্ধ করল দোয়েল। স্কুলের চাকরিটা পেয়েছে আজ প্রায় চার বছর। সরকারী স্কুল, তাই রোজগার বিরাট না হলেও ছুটির অন্ত নেই। যখনি দিন দুয়েকের ছুটি পায়, হালিশহর ছেড়ে টুকটাক এদিক-ওদিক ঘুরে আসে জনা তিনেক বন্ধু মিলে। এবারের লক্ষ্য ছিল ধন্যকুরিয়া। বসিরহাটের কাছে এই ছোট্ট নগরটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েক শতাব্দি প্রাচীন ব্রিটিশ ও মোঘল স্থাপত্য। এছাড়াও ধন্যকুরিয়া বিখ্যাত এসব স্থাপত্য ঘিরে নানান ভৌতিক কিংবদন্তীর জন্য। ছোটবেলা থেকেই ভূতের গল্পের টান দোয়েলের প্রবল। বাবা, জ্যেঠু সকলের থেকে রাশি রাশি ভূতের গল্পের বই উপহার পেত সে আর নিমেষের মধ্যে পড়ে শেষ করে ফেলত। এবারেও অনামিকা আর সঙ্গীতাকে দোয়েলই রাজী করিয়েছিল ধন্যকুরিয়া যাওয়ার জন্য। অনামিকা মনোস্তত্ত্বে ডক্টরেট করে তিন জায়গায় প্র্যাকটিস শুরু করেছে আর সঙ্গীতা বেশ কয়েকবছর বিমা সংস্থার এজেন্ট হিসেবে বেশ পসার জমিয়ে ফেলেছে। অর্থনৈতিকভাবে তিনজনেই স্বচ্ছল আর বেড়ানো-পাগল। মেয়ে হিসেবে ডানপিটেও বটে। ধন্যকুরিয়াতে রাতের অন্ধকারে তিনজন চুপি চুপি গাইন প্যালেস-এর বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছিল নুপুরের আওয়াজ বা ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনার আশায়। সে আশা তাদের পূর্ণ হয়নি ঠিকই কিন্তু তাদের গেস্ট হাউজের রাঁধুনি বরকৎ মিয়াঁর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। তিন বান্ধবী সব ডায়েট চার্ট ভুলে পেটপুরে খেয়ে গেছে এই দুদিন।

ফেরার আগে দোয়েলের একটা ভারী আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়ল। রিক্সা করে ষ্টেশনে আসার আগে বাঁ দিকে মাঠের মধ্যে ইটের পাঁজা বের করা ছোট্ট গুমটি ঘরটা সম্ভবত একশো বছর আগে জলসত্র ছিল। এখন তার মাথার

ওপর গাছ গজিয়েছে, গায়ে পালেস্তারার নামগন্ধও নেই। তার ভেতর একজন অতিবৃদ্ধ মানুষ কয়েক ডজন পুরনো বই নিয়ে বেশ পসরা সাজিয়েছে। এমন গেঁয়ো জায়গায় এত অদ্ভুত একটা বইয়ের দোকান! ব্যাপারটা বেশ মজার লাগল দোয়েলের। সে ছোটবেলা থেকেই বইয়ের পোকা। এগিয়ে গিয়ে এ-বই সে-বই ঘেঁটে খয়েরী রঙের একটা মোটা বই তুলে নিল। ওপরে সোনালী অক্ষরে চিনা বা জাপানী ভাষায় কিছু লেখা, তলায় তার ইংরিজি অনুবাদ দেওয়া 'Uji Shui Monogatari - Chronicles & Folklores from Ancient Japan'.

— "কত?"

অতিবৃদ্ধ লোকটি মুখ তুলে তাকাল। চোখের চামড়া ঝুলে তার দৃষ্টি প্রায় ঢেকে দিয়েছে। কাঁপা গলায় সে উত্তর দিল, "তিরিশ টাকা।"

গরীব মানুষ। আহা, এই বয়সেও রোজগারের আশায় বেড়িয়েছে। দোয়েল একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল বাকি টাকা ফেরত না দিতে।

ফেরার পথে সেটাই উলটে পালটে দেখছিল সে। একটা অধ্যায়ের শিরোনাম দেখে হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল। একটা অদ্ভুত নাম; 'GHID'RA'। দোয়েল পড়তে লাগল অধ্যায়টা। তাতে লেখা এমন এক অপশক্তির ব্যাপারে যে মাথাচাড়া দেয় তিনজন পিশাচের বিশেষ মিলনে! পাতা ওল্টালো দোয়েল। পরের পাতায় একটা ডায়াগ্রাম আঁকা। তলার লেখাগুলো অস্পষ্ট। এত পুরনো বই, সম্ভবত জলে ভিজে উঠে গেছে। তবে ছবিটা বোঝা যায়। ছোটবেলায় মধুপুর আদর্শ বিদ্যালয়ে পড়তে বিজ্ঞানের বইতে এরকম ছবি সে অনেকবার দেখেছে। ছবিটা একটা সাদাকালো সৌরমণ্ডলের ডায়াগ্রাম। কিন্তু... ন'টার বদলে আটটা গ্রহ কেন? এই বই যবে লেখা হয়েছিল তবে কি ন'টা গ্রহ আবিষ্কার হয়নি? নাকি জাপানীরা আটটা গ্রহই মেনে চলত?

বইটা বন্ধ করে পাশে রাখল দোয়েল। পাশের সিটে অনামিকা হাঁ করে তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। উঠে গিয়ে বাথরুম থেকে মুখে চোখে জল

দিয়ে এসে নিজের সিটে বসে দোয়েল আরেকটা বই খুলল। একটা ভূতের গল্পের সমগ্র। একজন লেখকের বারোটা গল্পের কালেকশন। লেখক 'আলাদিন' ছদ্মনামে লেখেন। তার আসল নাম বা লেখক পরিচয় কোনও বইয়ে দেওয়া থাকে না। কিন্তু আলাদিনের গল্পের টান যে কি আমোঘ তা দোয়েল এক পূজাপত্রিকায় একটি গল্প পড়েই বুঝতে পেরেছিল। তারপর বিভিন্ন দোকান ঘুরে, বিভিন্ন ভূতের গল্পের সমগ্র ঘেঁটে আলাদিনের লেখা গল্প রয়েছে এমন বই সে জোগাড় করতে শুরু করে। গল্পগুলোতে হাড় হিম করা ভয় না থাকলেও প্লট আর চরিত্রের এমন বৈশিষ্ট থাকে যেন পড়ে মনে হয় ঘটনাগুলো সত্যিই লেখকের সাথে ঘটেছে। এই মানুষটার ব্যাপারে কৌতূহল বাড়তে থাকে দোয়েলের।

একদিন সুযোগ আসে। প্রকাশকের অফিসের একটি কম্পোজিটর সঙ্গীতার মামাতো ভাই বেরোয়। তাকে হাত করে এডিটরের কাছ থেকে আলাদিনের নম্বর জোগাড় করে দোয়েল। এ ছাড়া ওঁর আসল নাম, কোথায় থাকেন, দেখতে কেমন, তা কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। একদিন রাতে 'আজান' বলে একটা গল্প শেষ করে দোয়েল বইটা বুকে করে প্রায় দশ মিনিট সিলিঙের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল। গল্পে ছ'বছরের ছোট্ট রহমানের চরিত্র তাকে এতটা ছুঁয়ে গিয়েছিল যে গল্পের শেষে যখন জানা যায় সে দেড় বছর আগে নিজের আম্মিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে... দোয়েলের মন ভিজে গিয়েছিল।

লজ্জার মাথা খেয়ে সেদিন রাতে দোয়েল 'আলাদিন'এর নম্বরে দু'লাইন লিখে পাঠাল;

"চেরাগ তোমার হাতের মুঠোয়, তবুও কেন বুক ভাঙাও?
জীনের দেশে লুকিয়ে থেকে, কেমনে এত মন রাঙাও?"
— দোয়েল মিত্র।

উত্তর এল পরদিন সকালে। বেশ বেলা করে। 'আলাদিন'এর নম্বরে কোনও ছবি দেওয়া ছিল না, এমনটাই আশা করেছিল দোয়েল। ওঁর উত্তর এল দুলাইনেই;

"খেয়াল আমার বেপরোয়া, মনের খাতায় হাজার ঋণ,

চেরাগ ভরা কল্পনা যার, কলমটাই তার আসল জীন!”

— আলাদিন।

হাসি খেলে গেল দোয়েলের ঠোঁটে। ক্লাসের মধ্যে ফোন ঘাঁটা নিয়মবিরুদ্ধ, তাই তখনকার মতো উত্তেজনা চেপে পিরিয়ড শেষ হলেই করিডোরে এসে সে উত্তর পাঠাল, “আলাদিনের গল্প ভালো লাগে। ওঁর ব্যাপারে জানা কি কোনোভাবে সম্ভব নয়?”

দোয়েল ছোট থেকেই প্রচণ্ড স্বাভিমানী। যতটা সম্ভব সংযত শব্দচয়ন করে উত্তর পাঠাল সে। যাতে তার উত্তরে কোনোভাবেই তার উত্তেজনা প্রকাশ না পায়। সেদিন রাত অব্দি কোনও উত্তর এল না। রাতে খেতে যাওয়া অব্দি বার বার ফোন দেখতে থাকল দোয়েল। মা খাবার টেবিলে আরেকবার তাকে মনে করালো তার মাসতুতো দিদিদের মতো তার জন্য হন্যে হয়ে পাত্র খোঁজা ওনার সম্ভব নয়, “তোমার তো একশো রকম চাহিদা। ছেলে এমন হবে, ছেলে তেমন হবে। হালকা দাড়ি থাকবে, ভুঁড়ি থাকবে না, চুল উঠবে না... তা বাপু তোমার বাবার বয়স হয়েছে। আমাদের পছন্দ করা বর যদি তোমার না পোষায়? এবার নিজে দেখে শুনে একটা ভালো ছেলে পছন্দ করে ফেলো দেখি। সাতাশ বছর বয়স হয়ে গেল, এখনও একটা প্রেম-টেম করতে পারলি না?”

দোয়েল উত্তর দিল না। বিয়ের নামে তার গায়ে জ্বর আসে। আর অমুক দিদি তমুক বোনের সাথে তুলনা করলে তো মাথায় আগুন জ্বলে যায়। সে নিজের চেষ্টায় দিনের পর দিন পরীক্ষা দিয়ে স্কুলের চাকরিটা পেয়েছে। কলেজ শেষ করে প্রায় প্রত্যেক রবিবার কখনও স্টাফ সিলেকশন, কখনও ব্যাঙ্ক ক্লেরিকাল, কখনও ফুড কর্পোরেশন এর পরীক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছে। নৈহাটি, চুঁচুড়া, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর... কোথায় না দৌড়েছে পরীক্ষা দিতে। তার সাথে স্কুল ফাইনালে থার্ড ডিভিশন পাওয়া মাসতুতো বোনেদের তুলনা টানলে ভারী রাগ হয় দোয়েলের। সে স্বাবলম্বী। গায়ের রং অল্প চাপা হলেও, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, চোখ দুটো ডাগর ডাগর আর প্রায় জোড়া ভুরু। মোটের ওপর সুন্দরী। সে যেমন সে তাতেই খুশি।

বিছানায় শুয়ে ঘুমে চোখটা প্রায় জড়িয়ে এসেছিল হঠাৎ ফোনের ‘টুং’

শব্দ দোয়েলের কানে এল...

"Marco Polo.
টেবিল নম্বর যোল।
সাতাশে জুন,
12-Noon.
Possible?"

মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেল দোয়েলের। দেখা করতে বলছে? তাকে? আলাদিন! পরক্ষণেই নিজের উত্তেজনা সামলে নিয়ে সে ভাবল, কি জানি বাবা! দুম করে দেখা করতে বলে দিল... কোনও বদ মতলব নেইতো? জানা নেই শোনা নেই... যদি বাবার বয়সী বিরক্তিকর কোনও বুড়ো ভাম বেরোয়? যদি উলটো-পালটা প্রস্তাব দিয়ে বসে? নাহ সে এখনি কিছু জানাবে না। ভেবে চিনতে পরে না হয় উত্তর দেবে।

হাতের বইটা শেষ করল দোয়েল। ট্রেনের দুলুনিতে অনামিকার ঘুমন্ত মাথাটা ঢলে পড়েছে পেছন দিকে। আলাদিনের একক সমগ্র খতম করার পর মনে একরাশ মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে ভাবল দোয়েল। আগের মেসেজগুলো পড়ল। যার কলমে এত রং... একবার সুযোগ নিয়েই দেখা যাক না। আজ তেইশ। তাকে দেখা করতে বলেছে সাতাশ তারিখ। অর্থাৎ চার দিন পর। দোয়েল ফোনটা তুলে লিখল।

— "সমগ্রটা সঙ্গে নিচ্ছি। কলম আনবেন। কথায় বলে লেখককে কলম ধার দিতে নেই..."

* * * * * * * * * *

দ্বারকা নদের ওপরের পুলটা থিকথিক করছে ভিড়ে। একে কাল রাতে অমাবস্যা গেছে তার ওপর আজ শনিবার। রথ-এর দিন। ভক্তেতে ছেয়ে গেছে তারাপীঠ। হঠাৎ সকলকে অবাক করে দিয়ে সাইরেন বাজিয়ে পর পর তিনখানা পুলিশ-ভ্যান ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করে পুলের মুখে এসে দাঁড়ালো। তারপর প্রায় জনা পনেরো খাকি উর্দিধারী তাড়াহুড়ো করে নেমে হাঁটা লাগাল

মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের উলটোদিকে মহাশ্মশানের ফটকের কাছে তিল ধারণের জায়গা নেই। সেবাইতরা হাত ধরাধরি করে ভিড়কে আটকাচ্ছেন মহাশ্মশানে প্রবেশ করার থেকে। পুলিশের ঝাঁক এসে পড়তেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। সেবাইতদের থেকে ভিড় সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন খাকি উর্দিধারীরা।

মহাশ্মশানের ঠিক মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালেন তারাপীঠ থানার বড়বাবু। তাঁর পেছন পেছন এসে দাঁড়ালেন বেশ কয়েকজন সেবাইত ও সেপাই। একটা প্রকাণ্ড শিমূল গাছের গোড়ায় একটা ছোট্ট আটচালা মন্দির। তার সামনে পড়ে আছে একটা ঝলসানো লাশ! শরীরটা এত ভয়ানকভাবে পুড়েছে যে হাত পা প্রায় ঝুরঝুরে ছাই হয়ে গেছে! মন্দিরের দেওয়ালে কালশিটে আর আশপাশের গাছপালা দেখলে বেশ বোঝা যায় আগুনের তাপ কতটা ভয়ংকর ছিল!

— "আজ ভোর তিনতে নাগাদ বাজটা পড়ে স্যার।" পেছনের সেবাইত বললেন, "এত ভয়ংকর জোরে বাজ আমি আজ অব্দি কখনও শুনিনি! যারা জেগে ছিল, বলল প্রায় অন্ধ করে দেওয়ার মতো আলোর ঝলকানি আর কালা করে দেওয়ার মতো শব্দ! মন্দিরের বাইরের মিটারটাও উড়ে গেছে স্যার!"

বড়বাবু এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন লাশটার দিকে। পুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কত সাধক-তান্ত্রিকই তো সাধনা করেন তারাপীঠের মহাশ্মশানে। ইনি তেমনই কেউ হবেন হয়তো।

— "যমের বাচ্চা শালা!"

আচমকা চিৎকারে সকলে পেছন ঘুরল! ছাই মাখা, দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা একজন প্রায় অর্ধনগ্ন সাধু হাতে একটা করোটি নিয়ে চিৎকার করছে।

— "হারামজাদা মায়ের পুণ্যভূমিতে শয়তানের ঘাঁটি বানিয়েছিল! দিনরাত ওই পাপের মন্তর পড়ত! নিজের রক্ত নিজে খেত! ওর সময় ঘনিয়ে এসেছিল! অনেকদিন থেকে মরবে মরবে করছিল! কাল রাতে তো আকাশ পানে তাকিয়ে মরার জন্য ছটফট করছিল! নরকের পোকা শালা! আপদ বিদেয় হয়েছে! নিয়ে যা এই নোংরাটাকে! এক্ষুনি নিয়ে যা!"

লোকটাকে দেখে বড়বাবুর ভালো লাগল না। একজন সেপাইকে বললেন

সরকারী ডোমকে খবর দিতে।

— "ও কী করছিস? ফেলে দে ওটাকে! এক্ষুনি জলে ফেল! ও বড় সাংঘাতিক জিনিস! সাক্ষাৎ নরক থেকে উঠে এসেছে! ও জিনিষ পাপ ছড়ায়! ফেল ফেলে দে!"

আবার চেঁচিয়ে উঠেছে সেই সাধু।

একজন সাব ইনস্পেক্টর নিচু হয়ে সেই পোড়া মন্দিরের ভেতর থেকে বের করে এনেছেন এক বিচিত্র বিগ্রহ। তাকে দেখতে পেটমোটা এক কদাকার শিশুর মতো, শুধু একটার বদলে তিনতে মাথা!

* * * * * * * * * *

পার্ক স্ট্রীটের সবচেয়ে অভিজাত রেস্তোরাঁগুলির একটি 'মার্কো পোলো'। সাতাশে জুন সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশে দোয়েল গিয়ে পৌঁছল সেখানে। নাতিশীতোষ্ণ রেস্তোরাঁর অন্দরটা প্রায় খালি। দু-একটা টেবিল ভর্তি। সকলেই নিখুঁত পোশাকে সজ্জিত, নিচু স্বরে কথা বলছে। দেয়ালগুলোয় সিমেন্টের রিলিফে নানান ছবি বানানো। দোয়েল ভালো করে দেখে বুঝল সেগুলো মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্য। একজন ওয়েটারকে ডেকে ষোল নম্বর টেবিল কোনটা জানতে চাইল দোয়েল।

— "আপনি মিসেস মিত্র?"

— "মিস।" একটু অবাক হয়েই উত্তর দিল দোয়েল।

— "সরি, মিস মিত্র। আসুন।"

ওয়েটার দোয়েলকে নিয়ে রেস্তোরাঁর কোণার দিকে একটা বিশেষ টেবিলে বসতে দিল। তারপর টেবিলের ওপর রাখা 'RESERVED' লেখা টেন্ট কার্ডটা তুলে নিয়ে গেল। দোয়েল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আর সব টেবিলগুলোর থেকে এই টেবিলটা একটু যেন উঁচু আর দামি। কাঠের চেয়ারে গদি লাগানো, যা বাকিগুলোতে নেই। একটু যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল তার। এত দামি একটা রেস্তোরাঁ... অচেনা একজন মানুষের সাথে হুট করে এমন দেখা করতে চলে আসা। তেমন ভালো সেজেও আসেনি সে। সাধারণ একটা কুর্তি আর

লেগিংস আর সাথে একটা চামড়ার হাতব্যাগ, ব্যাস।

— "লেমোনেড?"

চেয়ার থেকে প্রায় উলটে পড়ে যাচ্ছিল দোয়েল। কথাটা যার মুখ থেকে বেড়িয়েছে সে যেন সামনের চেয়ারটায় প্রায় হাওয়ার মধ্যে থেকে প্রকট হয়েছে! এক সেকেন্ড আগেও তো সে কাউকে আসতে দেখেনি...

— "সাবধানে..."

দোয়েল সামলে নিল নিজেকে। তারপর ভালো করে দেখল সামনে বসা মানুষটাকে। সে ভুল ভাবছিল। এ আদৌ তার বাবার বয়সী নয়। বরং বয়সে দোয়েলের থেকে বছর দেড়েকের ছোট হলেও দোয়েল আশ্চর্য হবে না। মাথায় এক মাথা ঢেউ খেলানো ঝাঁকড়া চুল। সরু চোয়াল, চোখা নাক আর মিশমিশে কালো চোখ। পরনে একটা ঢোলা কালো শার্ট, হাতে চামড়ার ব্যান্ডের ঘড়ি। নিতান্তই সাদামাটা সাজ। দোয়েল বৃথাই নিজের সাজগোজ নিয়ে ভাবছিল।

— "আপনি?"

— "অত্রি... অত্রি সেন। আলাদিন।" হেসে উত্তর দিল দোয়েলের সামনে বসা বছর ছাব্বিশের যুবক।

লম্বা শ্বাস ছাড়ল দোয়েল। একটা অদ্ভুত নিশ্চিন্তের অনুভূতি হচ্ছে তার। গল্পের গাম্ভীর্যগুলির সাথে সামনে বসা যুবককে মনে মনে মেলাতে লাগল দোয়েল। নাহ... ঠিক খাপ খাচ্ছে না। তবে এও ঠিক, ছেলেটির চোখদুটো যেন কয়েক মাইল গভীর। দেখলে মনে হয় আর পাঁচজনের থেকে সে অনেক বেশি দেখে আর অনেক বেশি জানে। মনে পড়ে গেল প্রথম মেসেজের ছড়ার লাইনগুলো... 'চেরাগ ভরা কল্পনা যার, কলমটাই তার আসল জীন!'

— "আমি দোয়েল।"

— "আমি আলাদিন... আর... এই আমার চেরাগ।" বলে পকেট থেকে একটা সরু রূপোলী কলম বের করল অত্রি। মুখে তার হাসিটা লেগেই আছে, "ভুলে যাইনি আনতে।"

দোয়েলও না হেসে পারল না। কয়েক সেকেন্ড অত্রির মুখের দিকে তাকিয়ে

সহসা মনে পড়ায় ব্যাগের ভেতর থেকে বইটা বের করে মেলে ধরল।

অত্রি লিখল; — "হোক না চেরাগ হাতের মুঠোয়,
মন ভাঙাতে কে বা চায়?
ভাঙনেই যার গল্প শুরু,
অমর হয় সে রূপকথায়।

— দোয়েলকে শুভেচ্ছা সহ, আলাদিন।"

ছেলেটির হাতের লেখা নিতান্তই কুচ্ছিত! তবে ছড়াটা বেশ লাগল দোয়েলের। অত্রি নিজে থেকে কথা কম বলে তবে কিছু জিজ্ঞেস করলে পরিপূর্ণ উত্তর দেয়। কথায় কথায় নিজের জীবনের এমন অনেক ঘটনা সে বলল যা সচরাচর প্রথম দেখায় কেউ বলে না। কীভাবে সে আর তার জমজ বোন মায়ের পেটে থাকার সময় তাদের বাবা সংসার ছেড়ে চলে যায়। কীভাবে নিজের হীনমন্যতা কাটাতে সে লিখতে আরম্ভ করে। কীভাবে প্রথম প্রকাশক তাকে ঠকিয়ে তার লেখা নিজের মেয়ের নামে চালিয়ে দেয়। তারপর কীভাবে নতুন প্রকাশকের হাত ধরে তার লেখক হিসেবে উত্তরণ ঘটে।

দোয়েলের বেশ ভালো লাগছিল কথাগুলো শুনতে। সে নিজের ব্যাপারেও অনেক কিছু বলে ফেলল অত্রিকে। তার ছোটবেলা, তার বেড়ে ওঠা, আঠারো বছর বয়সে তার প্রথম প্রেমে ধাক্কা খাওয়া... সব। কথা বলতে বলতে দোয়েল লক্ষ্য করল অত্রি বক্তার থেকে শ্রোতা হিসেবে বেশি ভালো। সে একদৃষ্টে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা শোনে। কথার মাঝখানে একবারও কথা বলে না। এবং সব কথার শেষে হালকা করে মুচকি হেসে মাথা নাড়ায়।

অত্রির পেছনের দেয়ালে রিলিফে তৈরি ছবিতে ওটা সম্ভবত শিখণ্ডী। তার পেছন থেকে অর্জুন ধনুক উঁচিয়ে রয়েছে লম্বা দাড়িওয়ালা ভীষ্মর দিকে। রিলিফের ঠিক ওপরে একটা বিশাল এলইডি টিভিতে খবর চলছিল। দোয়েলের চোখ টানল একটা নির্দিষ্ট খবর। তার দেখাদেখি অত্রিও ঘুরে তাকাল টিভির দিকে।

খবরটা পুরীর। সদ্য সাইক্লোনের কবল থেকে মুক্ত হওয়া পুরীতে রথযাত্রা সম্পন্ন হতেই এক ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে! শ্রীক্ষেত্র চ্যারিটেবল হাসপাতাল

ও পুরী স্টেট জেনারেল হাসপাতাল মিলিয়ে একসাথে আটজন প্রসূতি মৃত সন্তান প্রসব করেছে! অর্থাৎ গতকাল এই দুই হাসপাতালে যে ক'জন শিশু জন্মেছে, তারা সকলেই মৃত জন্মেছে!

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল দোয়েলের! এমন ঘটনা তো আগে কখনও শোনা যায়নি! অত্রির ভুরু কুঁচকে গেছে। সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে টিভির পর্দার দিকে। গোটা পুরীতে এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। উড়িষ্যার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গড়ে দিয়েছেন এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য।

লাঞ্চ শেষ হলে বাড়ি ফেরার পালা এল। খবরটা দেখার পর থেকে অত্রি কেমন যেন অন্যমনস্ক... তবুও সে হাঁটতে হাঁটতে দোয়েলের সাথে মেট্রো স্টেশনের দরজা অব্দি এল। যতক্ষণ না দোয়েল সিঁড়ি দিয়ে নেমে সুড়ঙ্গের আড়ালে চলে গেল ততক্ষণ অত্রি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইল। দোয়েল সুড়ঙ্গের ভেতরে যাওয়ার আগে একবার পেছন ফিরে তাকালো। অত্রির সাথে চোখাচোখি হতেই সে নজর ঘুরিয়ে নিল। দোয়েল নিজের মনেই ছোট্ট করে মুচকি হাসল। অত্রি কিছুই করল না, তবুও কেন যেন দোয়েলের বেশ লাগল অত্রির মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াটা।

ট্রেনে ফিরতে ফিরতে দোয়েল বইটা খুলে দেখল। ছড়াটা বেশ কয়েকবার নিজের মনেই পড়ল। কলমের কালি থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে। বইটা বন্ধ করে ব্যাগে রাখল দোয়েল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। সে এসেছিল সম্পূর্ণ অচেনা একটা মানুষের সাথে দেখা করতে। এখন যখন মানুষটাকে চেনা গেল। তার সাথে নিজের মনের অদৃশ্য লেখকটাকে যেন কিছুতেই মেলাতে পারলো না দোয়েল। অথচ অত্রির সাথে কথা বলে মনে হয় যেন কত দিনের চেনা।

বাড়ি পৌঁছতে রাত হল দোয়েলের। স্টেশনে নামতেই বৃষ্টি পেল সে। বাড়ির সামনে রাস্তাটা আজ যেন একটু বেশি থমথমে লাগছে। খাবার টেবিলে বসতেই ফোনটা বেজে উঠল দোয়েলের। তার বাবা কড়া ধাঁচের লোক। খাওয়ার সময় ফোন ঘাঁটাঘাঁটি বা ফোনে কথা বলা উনি একদম পছন্দ করেন না।

স্ক্রীনে সঙ্গীতার নাম আসছে দেখে দোয়েল ফোনটা কেটে দিল। সঙ্গীতা ফোন করলে সহজে ছাড়ে না। তার সাথে না হয় খাওয়ার পরই আড্ডা মারা যাবে। মা সবে পাতে এক হাতা ভাত দিয়েছেন এমন সময় ফোনটা দ্বিতীয় বার বেজে উঠল। কী ব্যাপার? ভুরু কুঁচকে গেল দোয়েলের। একবার কেটে দেওয়ার পর সঙ্গীতা যখন সাথে সাথে আবার করেছে তার মানে দরকারটা নিশ্চয়ই জরুরী। বাবার ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই দোয়েল ফোনটা ধরল।

— "বল।"

ওপার থেকে প্রচণ্ড কোলাহলের আওয়াজের মধ্যে সঙ্গীতার কণ্ঠস্বর প্রায় বোঝাই গেল না। দোয়েল ফোনটা কেটে নিজে থেকে সঙ্গীতাকে ধরল। তারপর কয়েক সেকেন্ড ফোনটা কানে ধরে থেকে কোনও কথা বলল না। শুধু দোয়েলের বাবা দেখলেন মেয়ের মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

— "কী ব্যাপার রে?"

দোয়েল বাবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, 'আমি আসছি।' বলে ফোনটা কাঁপা হাতে কান থেকে নামিয়ে আনল।

খাবার ঘরটা হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল। পাশের বাড়ির টিভির শব্দ ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। দোয়েল খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইল। দৃষ্টি ফ্যালফ্যালে...

— "কী হয়েছে রে, বল? কোনও খারাপ খবর?" দোয়েলের মা উদবিগ্ন মুখে বললেন।

— "আমায় একটু সঙ্গীতার বাড়িতে ছেড়ে আসবে, বাবা? আজ রাতে ফিরতে পারব না।"

— "আসব, কিন্তু কী হয়েছে সঙ্গীতার?"

দোয়েল পাশে রাখা গ্লাস থেকে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে বলল, "সঙ্গীতার দিদির আজ ডেলিভারির ডেট ছিল। দুপুর থেকে ব্লীডিং হতে শুরু করে। একটু আগে খবর আসে পেটের ভেতরেই বাচ্চাটার শরীরে হঠাৎ পচন ধরতে আরম্ভ করে। সে এমন ফুলে ওঠে যে ওকে টুকরো করে বের করতে হয়, নাহলে ওর দিদিকে বাঁচানো যেত না। ওর মাকে এখনও ও খবরটা দিতে পারেনি। ফোনে প্রচণ্ড কাঁদছে আর আমায় যেতে বলছে.."

দোয়েলের বাবা-মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

— "ওর দিদিরা তো বোধহয় বাইরে কোথাও থাকে তাই না?" দোয়েলের মা বললেন।

— "হ্যাঁ, ওর জামাইবাবু হিন্দুস্তান কপারে আছে, এখন উজ্জৈন-এ পোস্টিং।"

— "বেশ, তুই খেয়ে তৈরি হ, আমি খেয়ে দিয়ে আসছি। রাতে ফোন খোলা থাকবে, দরকার হলে জানাবি।" দোয়েলের বাবা মোলায়েম সুরে বললেন।

দোয়েল কোনোরকমে কিছু মুখে দিয়ে তৈরি হয়ে নিল। মনের মধ্যে একটা বিষাক্ত আশঙ্কা উঁকিঝুঁকি মেরে চলেছে। তার বাবা তাকে নিজের স্কুটারে সঙ্গীতার বাড়ি পৌঁছে এসে বিছানায় মশারি টাঙাতে টাঙাতে রাতের খবরটা চালালেন। আর হঠাৎ থমকে গেলেন।

সুবেশী পাঠিকা গড়গড় করে পড়ে যাচ্ছেন একটা অস্বস্তিকর খবর; পুরীর পর উজ্জৈন শহরে সদ্যজাতদের মৃত্যু মিছিল! আজ উজ্জৈনের আঠারোটি হাসপাতাল মিলিয়ে একত্রিশটি মৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে! বিশেষজ্ঞরা কোনও মজবুত কারণ দর্শাতে পারছেন না এই মড়কের। কেউ বলছেন নতুন ধরনের কোন মারণ ভাইরাস, কেউ বলছেন প্রেগনেন্সির সময় ব্যবহার করা কোন ড্রাগের কোনও মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া... কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে পারছেন না এতগুলো পরিবারের হাহাকারের দায় কার।

হালিশহর থেকে অনেক মাইল দূরে একটা ময়লা কাউচের ওপর এলিয়ে শুয়ে আরও একজন খবরটা শুনছিল। বাঁ হাতে ধরে রিমোটটায় আলতো চাপ দিতেই পর্দার ছবি উধাও হয়ে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল আলো-আঁধারি ঘরটা। কাউচের পাশ দিয়ে মাথাটা এলিয়ে দিল অত্রি সেন। লম্বা ঝাঁকড়া চুলগুলো ঝুলে পড়ল হাওয়ায়। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে চাপা স্বরে বলল,

— "তৈরি হ অস্মি। সে আসছে!"

* * * * * * * * * *

সকাল থেকে গুমরে চলেছে মেঘ। বাতাসে কেমন এক ভ্যাপসা দমবন্ধ করা অনুভূতি। তারাপীঠ মহাশ্মশানে আজ থিকথিক করছে ভিড়। তারাপীঠের বাতাস ফালাফালা হয়ে চিরে গেছে কান-ফাটানো মরাকান্নার চিৎকারে! যেদিকে চোখ যায় কাঁথা, তোয়ালে, থান মোড়ানো সদ্যজাতদের নিথর দেহ কোলে নিয়ে স্বজনদের বুকফাটা হাহাকার! গর্ত খুঁড়ে চলেছে ডোমেরা একের পর এক। রামপুরহাট, বাতাইল, খানপুর, বেলিয়া এই সমস্ত জায়গা জুড়ে গত দু'দিনে একসাথে বত্রিশটি শিশু হারিয়েছে বত্রিশটি পরিবার! তার বেশিরভাগই মৃত জন্মেছে, কিছু জন্মেই মারা গেছে। এদের অধিকাংশই এসেছে তারাপীঠ মহাশ্মশানে ছোট্ট শরীরগুলোকে শেষ বিদায় জানাতে। দেহগুলির দিকে তাকানো যায় না। একরত্তি মুখ, খুদে খুদে হাত-পা নিথর কাঠ! পুলিশ, চিকিৎসক, প্রশাসন নীরব অন্ধকারে! না কারোর কাছে কোন সদুত্তর আছে আর না ব্যাখ্যা।

— "প্রথমে পুরী, তারপর উজ্জৈন... এখন আমাদের এখানে! এ কি শুরু হয়েছে বলুন তো! এই একরত্তি প্রাণগুলো কী পাপ করেছিল?" শ্মশানের বাইরের একদল মহিলা বলাবলি করছে। আজ মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। তারাপীঠ ছেড়ে পালানোর হিড়িক লেগে গেছে পর্যটকদের মধ্যে। কেউ ভাবছে রোগ ছড়িয়েছে, কেউ ভাবছে দেবীর অভিশাপ... শুধু সেই ছাই মাখা অর্ধনগ্ন সাধু শ্মশানের মাঝামাঝি বসে বিড়বিড় করে চলেছে...

— "শালাকে আগেই ক্ষুর দিয়ে গলা চিরে মেরে দিলে হত। কি ভুল করে ফেললাম, হে ঈশ্বর! কি ভুল করে ফেললাম!"

* * * * * * * * * *

সঙ্গীতা মা'কে নিয়ে উজ্জৈন চলে গেছে গতকাল। দোয়েল এই ক'দিন স্কুল গেছে বটে তবে এই তিন শহরের ঘটনা তাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন রাতে সঙ্গীতাকে সে যেই অবস্থায় দেখেছে তা কল্পনা করতে তার এখনও কষ্ট হয়। তার দিদি মৃত শিশু প্রসব করেছে, এই কথা সঙ্গীতার মাকে জানিয়েছিল

দোয়েল নিজে। ভদ্রমহিলা তাৎক্ষণিক কোনও বিস্ফোরক কষ্টের বহিঃপ্রকাশ করেননি ঠিকই। কিন্তু সেই রাতেই ওনার সুগার বেড়ে প্রায় মরো মরো অবস্থা হয়ে যায়। ভাগ্যিস দোয়েল সেই রাতে সঙ্গীতার বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, নাহলে বেচারি অত রাতে একা কী করতো।

বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। দোয়েলের সর্বক্ষণের সঙ্গী বই। উত্তরের জানলাটার তলায় একটা পুরনো সোফা রয়েছে যার ওপর ডাই করা বই আর কাপড়-জামার স্তূপ। তার পাশে একটুখানি খালি জায়গায় দোয়েল পিঠে কুশন দিয়ে কুঁকড়ে বসে বই পড়তে ভালোবাসে। আজ কেন জানি মন বসছে না বইয়ের পাতায়। ঘরের কোণার ছোট্ট টাইমপিসটা মিহি আওয়াজে জানিয়ে দিল রাত এগারোটা বেজে গেছে। অনামিকা এমনিতেই সারাদিন পর ফ্ল্যাটে ফেরে প্রায় সাড়ে দশটায়। সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে।

বইটা পাশে রাখল দোয়েল। অত্রির সাথে সেদিন দেখা হওয়ার পর থেকে কথা হয়নি আর। আজ মনটা ভালো নেই। দোয়েল লিখল;

— "আলাদিন কি এখন ঘুমের দেশে?"

কয়েক মিনিট লাগল মেসেজটা 'সীন' হতে। জেগে আছে অত্রি। এক মিনিট... দু মিনিট... পাঁচ মিনিট... উত্তর এল না। এটা কেমন হল? অত্রি কি ঘুমের ঘোরে মেসেজ দেখেছে? দ্বিতীয় মেসেজটা করার আগে দোয়েল দুবার ভাবল... বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না তো সে? নাহ... আর একটা মেসেজ পাঠাবে সে। উত্তর না এলে আর বিরক্ত করবে না অত্রিকে। দোয়েল লিখল;

— "বেশ, কাল কথা হবে।"

মেসেজ ডেলিভার হওয়ার প্রায় সাথেই সাথেই 'সীন' হোল। নাহ, দিব্যি জেগে আছে অত্রি। সম্ভবত লেখালেখি করছে। কিন্তু তা করলে তো মেসেজ দেখতে কিছুটা সময় লাগার কথা। সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিচ্ছে যখন তখন নিশ্চয়ই সে ফোন ঘাঁটছে। সে কি অন্য কারোর সাথে কথা বলছে? একটু অদ্ভুত লাগল ভাবতে দোয়েলের... বা রে! বললেই বা। দোয়েলের তাতে অস্বস্তির তো কারণ থাকতে পারে না...। নাহ, আর সে মেসেজ করবে না। নিজেকে এতটা সস্তা সে বানাবে না।

বাথরুমে যাওয়ার জন্য সোফা থেকে উঠতেই হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল! স্ক্রিন জুড়ে নাম ফুটে উঠেছে;

— "A-L-A-D-D-I-N"

কয়েক সেকেন্ড থমকে গেল দোয়েল। অত্রি নিজে থেকে ফোন করেছে তাকে!

স্ক্রিনের ওপর আঙুল বুলিয়ে দোয়েল ফোনটা ধরল। একটু উত্তেজনা, একটু ভালো লাগা মেশানো স্বরে বলল, "হ্যালো।"

ওপারে সব চুপচাপ... লাইন কি কেটে গেল? কই না তো... পেছনের হাওয়ার আওয়াজ, ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে দিব্যি... তাহলে ফোন করে কথা বলছে না কেন অত্রি?

— "হ্যালো?" এবার কথা এল। নারীকণ্ঠে!

— "ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে!"

দোয়েল কয়েক সেকেন্ড ফোনটা কানেই ধরে রইল। কখন যে লাইন কেটে বিপ বিপ শব্দ হয়ে চলেছে এতক্ষণ খেয়ালই করেনি।

অত্রির বোন? সে কি ভাইয়ের ফোন ঘাঁটছিল? আজব মেয়ে তো! আবার ফোন করে এটা স্পষ্টও করে দিল যে দোয়েলের মেসেজগুলো পড়েছে!

কতরকম বিকৃত রুচির মানুষ থাকে জগতে। দোয়েল ফোনটা চার্জে বসিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘরের পাখাটা আজ কমিয়ে রেখেছে সে। টানা বৃষ্টির ফলে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। দোয়েলের পায়ের সোজাসুজি তার ড্রেসিং টেবিলটা। আয়নায় জানলার বাইরের গাছপালা ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে দোয়েলের।

বিদ্যুৎ চমকালো বাইরে... জানলার বাইরে... ওটা কে? লম্বা টান চেহারা... ঝাঁকড়া চুল... অত্রি না? সে এখানে কী করে এল? আর তার মুখটা অমন শুকনো লাগছে কেন? যেন সমস্ত সুখ কেউ চুষে নিয়েছে মন থেকে! কাঁধ ঝুলে গেছে, কোমর ঈষৎ নুয়ে পড়েছে... সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে দোয়েলের দিকে। যেন কিছু বলতে চায়। হঠাৎ যেন স্ট্রীট লাইটের আলো কমে এল। এত কুয়াশা এল কোথা থেকে। যেন চারিদিক ঝাপসা হয়ে

আসছে। তার মধ্যে সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে অত্রি। দোয়েলের মুখ থেকে এক ইঞ্চিও নড়েনি তার দৃষ্টি... হঠাৎ দোয়েলের নজর গেল অত্রির পেছনে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে। কালো ধোঁয়ার মতো আবছায়া একটা মানুষের অবয়ব! অত বিশাল শরীরটা কার? যেন মুহূর্তে মুহূর্তে আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে তার! চেঁচাতে গেল দোয়েল। কেউ যেন বুকের ওপর একমণ ওজন চাপিয়ে দিয়েছে... গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বেরোল না। ছায়াটা আরও এগিয়ে আসছে অত্রির দিকে! দোয়েল প্রাণপণ চেষ্টা করল চিৎকার করে অত্রিকে সাবধান করার। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। অত্রির মুখটা হঠাৎ কুঁকড়ে গেল একটা বিশ্রী অভিব্যক্তিতে। যেন ভেতরে থেকে নিংড়ে নিচ্ছে কেউ তাকে... ধোঁয়ার মতো দানবীয় শরীরটা আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরছে তাকে। নারকীয় যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে অত্রির হাত-পা। সে ঝটকা মারছে সেই অপার্থিব শক্তির থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য... কিন্তু ধীর ধীরে তার শরীরটা সেই ধোঁয়ার মতো অন্ধকার অবয়বটির ভেতরে হারিয়ে যেতে লাগল। দোয়েলের হাত পা যেন আটকে গেল শরীরের সাথে... এ কি দেখছে সে? অবয়বটির মাথার কাছটা যেন কেঁপে উঠল... তারপর ঘাড়ের পেছন দিয়ে দু'দিক দিয়ে বেড়িয়ে এল ধোঁয়ার মতো আরও দুটো মাথা! তারপর সেই তিনটে মাথায় অঙ্গারের টুকরোর মতো জ্বলে উঠল তিন জোড়া ধ্বকধ্বকে চোখ!

লাফিয়ে উঠল দোয়েল!

পুরো ঘর যেন ভূমিকম্পের মতো দুলছে তার। খাটের ছত্রী আঁকড়ে ধরে মিনিট দুয়েক সেইভাবেই বসে রইল দোয়েল। মনে হোল যেন দুলুনিটা কম লাগছে। দু'হাতে কপালের দু'দিক চেপে ধরল সে... ধমনীগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই রক্ত এত জোরে দৌড়চ্ছিল যে তার মনে হচ্ছিল গোটা ঘর দুলছে! এ কি দেখল সে? এমন দুঃস্বপ্ন তো সে আগে কখনও দেখেনি। অত্রি... তার কোনও বিপদ হোল না তো? মনে হোল একবার লজ্জা সরিয়ে ফোনটা করেই ফেলে অত্রিকে, কিন্তু পরক্ষণেই সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করল।

মুখে চোখে জল দিতে গিয়েও দোয়েল বুঝতে পারল মাথাটা তার এখনও টালমাটাল। বাবা-মা গতকাল শান্তিপুর গেছে ছোট মাসির শাশুড়িকে দেখতে।

তাঁর প্রায় মরো মরো অবস্থা। দোয়েল আপাতত বাড়িতে একা। ঘরে ফিরে সে ঠিক করল কাল অনামিকাকে ফোন করে ডেকে নেবে। একটা তো দিন; মা-বাবা না ফেরা পর্যন্ত তাকে নিজের বাড়িতেই রেখে দেবে।

* * * * * * * * * *

বাইরে মেঘের গর্জন এখন একটু কম। এক ফালি মেঘের ফাঁক দিয়ে হালকা চাঁদের আলো উঁকি দিচ্ছে। দেখতে দেখতে পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এল। মেঘের ফালির ভেতর দিয়ে কমলা আভা ফুটে উঠল। ওই আকাশের নিচে বহুদূরে তারাপীঠের মহাশ্মশানে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবছা কুয়াশা-ঘেরা ভোরের আলোমাখা মহাশ্মশানে ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিছু যেন খুঁজছেন তিনি। এদিক ওদিক থেকে কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়া জমাট বেঁধে রয়েছে সদ্য নিভে যাওয়া চিতার ছাইয়ের ওপর।

— "কে পাঠিয়েছে তোকে?" হুঙ্কারের মতো প্রশ্নকর্তার স্বর। তার দিকে ফিরে তাকালেন বৃদ্ধ।

দ্বারকার জল থেকে এক ফালি কাপড় পরে হাতে একটা পুরনো কমন্ডুলু নিয়ে উঠে আসছে এক আধপাগলা দেখতে সাধু। বোঝাই যায় সে স্নান করতে নেমেছিল।

বৃদ্ধ বোঝালেন যে তিনি মধ্যপ্রদেশের লোক তাই বাংলা অত ভালো বোঝেন না। সাধুবাবা ওঁকে হাতের ইশারায় ডাকলেন তারপর কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের নিচে চট আর প্লাস্টিকের তৈরি একটা ছোট্ট ছাউনির তলায় বসালেন। বৃদ্ধ দেখলেন সাধুবাবার 'ডেরায়' গুচ্ছের বোতল, শেকড়-বাকড়, মানুষের আধপোড়া হাড় আর গোটা তিনেক মাথার খুলি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

সাধুবাবা হিন্দি মেশানো বাংলায় বললেন, "নাম কেয়া?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "পবন কুমার দ্বিবেদী।"

— "আসা হচ্ছে কোথা থেকে?"

— "মাধবগড়, উজ্জৈন এর কাছে।"

কয়েক মুহূর্ত থেমে গেলেন সাধুবাবা। মাথা নাড়লেন নিজের মনে তারপর বললেন, "এখানে কাকে খুঁজছিস?"

দ্বিবেদীমশাই মাথা নিচু করে বললেন, "জানি না, শুধু এইটুকু আন্দাজ করেছি যে উজ্জৈনের মতো এখানকার শিশুমৃত্যু কোনো পার্থিব কারণে হচ্ছে না। আমি আচার্য সদাশিব চতুর্বেদীর কাছে দীক্ষা নেওয়া সাধক। ওনার থেকে আমি যা শিখেছি তাতে এইটুকু বুঝতে পারছি পুরী, উজ্জৈন আর তারাপীঠ, এই তিন জায়গার ঘটনা এক সুতোয় বাঁধা। এটা মনে হতেই আমি ঘরে বসে থাকতে পারিনি। ছেলেকে বললাম টিকিট করে দিতে। আমি কাল রামপুরহাটে পৌঁছই। সেখানকার স্টেশন মাস্টার ভরতপুরার লোক, আমাদের ওখানেই... উনি বললেন গত কয়েকদিনে তারাপীঠ সংলগ্ন এলাকায় কোনও জীবিত শিশু জন্মায়নি! উজ্জৈনের ঘটনার সাথে আশ্চর্য মিল।"

গম্ভীরভাবে দ্বিবেদীমশাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সাধুবাবা। এবার পাশে পড়ে থাকা হাড়ের তৈরি কল্কেটায় আগুন দিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, "ব্যাস? এই কারণেই অত দূর থেকে ছুটে এলি?"

দ্বিবেদীমশাই খানিকক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "কারণ আরেকটা আছে..."

— "কী?"

দ্বিবেদীমশাই বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি মাধবগড়ের কাছের একটি শ্মশানকালীর মন্দিরের নিত্য পূজারী। একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার সাথে। শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরে আমার গুরুদেবের লেখা একটি বহু পুরনো পুথি আমি আমার ঘরে একটা ঝোলার মধ্যে খুঁজে পাই। সেই ঝোলা বা তার ভেতরকার জিনিসপত্র কীভাবে আমার ঘরে এল তা অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না। এর দিন তিনেক পর এক তরুণ সন্ন্যাসী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলে যে সে কনখল-এর আশ্রম থেকে আমার গুরুদেবের খোঁজে এসেছে। আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়ি। এক দশকের ওপর আমার গুরুদেবের সাথে দেখা সাক্ষাৎ নেই। ওঁকে খুঁজতে হঠাৎ আমার কাছে কেন? জবাবে তরুণ সন্ন্যাসীটি বলল যে গুরুদেব নাকি আমার

এখানে আসবেন বলে কনখল-এর আশ্রম থেকে রওনা দিয়েছিলেন। সে নিজে নাকি গুরুদেবকে মাধবগড় অব্দি পৌঁছে দিয়ে গেছে। উনি তাহলে গেলেন কোথায়? আমি তার থেকে লুকিয়ে গেলাম যে গুরুদেবের পুঁথি আমি আমার বাড়িতে পেয়েছি। আশ্চর্যের ব্যাপার যেই মানুষটি আমার বাড়ি আসবে বলে বেরোলেন তিনি গেলেন কোথায়? আর যদি উনি নাই এসে থাকেন তাহলে ওই পুঁথি আমার বাড়িতে পৌঁছল কীভাবে?

এই ভাবতে ভাবতে আমি পুঁথিটা পড়তে আরম্ভ করি। গুরুদেব তন্ত্র মতে তত সিদ্ধহস্ত না হলেও জ্যোতির্বিদ্যা আর অতিপ্রাকৃততত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন। একেক সময় সমাধিতে বসে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা অব্দি লীন হয়ে থাকতেন। অনেকবার এমন হয়েছে যে সমাধি ভাঙার পর ওনার রক্তচাপ বেড়ে যেত। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ত। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল উনি জাগতিক স্তর থেকে মহাজাগতিক স্তরে নিজের চেতনাকে নিয়ে যেতে পারতেন। যদিও আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও উনি তা অস্বীকার করে গেছেন। পুঁথির যেই অধ্যায়টিতে এসে আমার চোখ আটকালো সেটি 'অষ্টগ্রহ সমন্বয়' নিয়ে লেখা। এমন এক মহাজাগতিক ক্রিয়া যেসময় সৌরমণ্ডলের আটটি গ্রহ এক সরল রেখায় এসে পড়ে। জ্যোতিষ ও প্রেতচর্চার ক্ষেত্রে এই সময়টির গুরুত্ব অপরিসীম। গুরুদেব লিখেছেন এই সময়ে নাকি তিন ভুবনের মধ্যে পরিগমন সবচেয়ে সহজ হয়। অতিজাগতিক বিদেহীরা এইসময় এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে চায়। আর ঠিক এই সময়ে যদি কখনও একাধিক অশুভ শক্তি নিজেদের স্তর থেকে অভিন্ন কারণে উত্তরণ বা অবতরণ ঘটিয়ে ফেলে তখন ঠিক যেমন অপকেন্দ্র বল গ্রহদের এক রেখায় বেঁধে আনে, তেমন কোন এক অতিজাগতিক অপকেন্দ্র বল সেই অপশক্তিদের মিলন ঘটায়। তারা এক হয়ে যায়। আর জন্ম নেয় এমন এক বিভীষিকা যার অস্তিত্ব জগতে হাহাকার আর সর্বনাশ ডেকে আনে!"

কিছুক্ষণ থামলেন দ্বিবেদীমশাই। লাশপোড়া গন্ধটা এতক্ষণে নাকে সয়ে গেছে। দূরে নদীর ওপারের জঙ্গল থেকে চিলের ডাক কানে আসছে। লম্বা শ্বাস নিয়ে আবার বলতে লাগলেন দ্বিবেদীমশাই।

— "গুরুদেব লিখেছেন আদি কালে বহু পিশাচ উপাসক নিজেদের শয়তানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েছেন। চব্বিশ বছর আগে অষ্টগ্রহ সমন্বয় হয়েছিল। তখন পুরীতে একটি গোষ্ঠী মাথাচাড়া দেয়, যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শয়তানের উপাসনা। সম্ভবত তারা সমন্বয়-এর সুযোগ নিয়ে নিজেদের উৎসর্গ করতে চেয়েছিল এই মিলিত বিভীষিকাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। হয়তো সফল হয়নি তারা। কিন্তু এই মিলিত বিভীষিকাকে কাল্পনিক রূপ দেয় তারা। নিজেদের সমস্ত ঘৃণা, সুখ, আহ্লাদ তারা উৎসর্গ করে তাদের এই নতুন 'দেবতা'র উদ্দেশ্যে। গুরুদেব নিজে হাতে পুঁথিতে এঁকে গেছেন সেই মূর্তি—"

— "কদাকার মানুষের বিকৃত বাচ্চার মতো চেহারা... একটার বদলে তিনটে মাথা— তাইতো?" সাধুবাবা এতক্ষণ চোখ বুজে শুনছিলেন দ্বিবেদীমশাই-এর কথা। এতক্ষণে হঠাৎ ওনার কথা কেড়ে নিজে বলে উঠলেন।

দ্বিবেদীমশাই মুখ হাঁ করে তাকালেন সাধুবাবার দিকে। "আপনি... কীভাবে...?"

সাধুবাবা কল্কের ছাই ঝেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, "কয়েকদিন আগে শ্মশানে এক নতুন ভৈরব-এর আগমন হয়। ভৈরব আর বলি কেমনভাবে, শালা হারামি! পাকা জোচ্চোর। আমরা যারা দীর্ঘদিন মায়ের নামে শ্মশানে সাধনা করছি, তাদের ওর হাবভাব চোখে লাগতে আরম্ভ করে। শালা না বুঝত বাংলা, না হিন্দি। হয়তো দক্ষিণের লোক ছিল। একদিন একটা বেওয়ারিশ মড়া টেনে তাতে ও আদ্যা শক্তির উদ্‌যাপন আরম্ভ করে। এই ভয়ানক আচার সম্পন্ন করার ক্ষমতা যে ওর নেই তা আমি ভালোই জানতাম। রাত পোহানোর আগে শালা রক্তবমি করতে আরম্ভ করে। মড়াটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পচে ফুলে ওঠে। আর ও আধমরা হয়ে পড়ে থাকে দিন দুয়েক। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ফিরতেই সে যেন মানুষ থেকে হঠাৎ জানোয়ারে পরিণত হয়। উলঙ্গ হয়ে শ্মশান থেকে বেড়িয়ে প্রথমে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে দাপাদাপি করে নিজের রাগ ব্যক্ত করতে থাকে। তারপর মন্দিরের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলে। সেবাইতরা তাকে তুলে এনে আবার শ্মশানে ফেলে রেখে যায়।

— "সেদিন থেকে তার আচার আচরণ একেবারে বদলে যায়। তার সাধনার ধরণ তন্ত্রমতে না হয়ে এমন কিছু উপাচার সে করতে আরম্ভ করে যা আমাদের অজানা। আর ওই তিন-মুখি মূর্তি নদীর মাটি দিয়ে বানিয়ে চিতার আগুনে পুড়িয়ে সেটাকে দিনরাত পূজা করতে লাগল। আধপোড়া মড়ার মাংস খুঁজে খুঁজে জ্বলন্ত চিতা থেকে এনে এনে খেতে লাগল। নিজের দেহ ফালাফালা করে চিড়ে রক্ত দিয়ে স্নান করাতো ওই কদাকার মূর্তিটাকে।"

শিউরে উঠলেন দ্বিবেদীমশাই। জড়সড় হয়ে বসলেন সাধুবাবার আরও কাছে ঘেঁষে।

— "রথের দু'দিন আগে। মেঘ করেছিল সারাদিন। ওই বিশাল শিমুলগাছটার তলায় ছোট্ট আট চালাটার পাশে ও সারাদিন শুয়ে রইল। মূর্তিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল, কখনও নিজের ভাষায় মূর্তিটার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বলল। সেদিন কোনও এক বাবু শ্মশানের সব ভৈরবকে ভোগ দিয়েছিল। কেউ একজন দয়া করে ওর পাশেও এক পাতা ভোগ নামিয়ে রেখেছিল। ও খায়নি। শেষ রাতের দিকে হঠাৎ গোটা এলাকা কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। আমি ভাবলাম বুঝি কানের পর্দা ফেটে গেছে আমার। হয়তো মুচ্ছো গেছিলাম কিছুক্ষণ। জ্ঞান ফিরতেই দেখি শিমুলগাছটার তলায় আট চালাটার পাশে কিছু একটা দাউদাউ করে জ্বলছে। বুঝলাম বাজটা ওখানেই পড়েছে। কাছে যেতেই দেখলাম ওই শালা জ্বলে ছাই হয়ে গেছে ততক্ষণে!"

দ্বিবেদীমশাই অনুভব করলেন তার গায়ের কুর্তাটা ঘামে ভিজে গেছে। কথাগুলো শুনতে শুনতে কখন যে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে তা খেয়ালই করেননি।

— "আপনি মনে করেন এই ভৈরব নিজেকে শয়তানের কাছে সঁপে দেয়? যদি এই মহাজাগতিক অপদেবতা আদৌ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার মিলিত শক্তির একটি হোল এই ভৈরব?" দ্বিবেদীমশাই কেটে কেটে প্রশ্নটা করলেন।

সাধুবাবা উত্তর দিলেন না।

— "কিন্তু, কিন্তু তাদের সমর্পণের কারণ তো এক হতে হবে। একটা তো..."

— "এক-বা এক জাতীয়। ঘেন্না! রাগ! অবিশ্বাস! শয়তানকে কেউ তখনই আপন করে নেয় যখন ভগবানের ওপর তার বিশ্বাস চলে যায়। যখন ভগবানের প্রতি অতি ভালোবাসা ঘুরে তারই সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রেও হয়তো তাইই হয়েছিল। এই মরণ খেলা শুরু হয়েছে তিনটে শহরে। তাদের মধ্যে তারাপীঠে মরেছিল এই হারামজাদা। বাকি দুই শহরের আশেপাশে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ একই কারণে নিজেদের আত্মাকে নিবেদন করেছে শয়তানের কাছে। পুরোটাই... অষ্টগ্রহ সমন্বয়ের সময়ে!"

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল দ্বিবেদীমশাইয়ের। সব যেন কেমন এক নিখুঁত নারকীয় ধাঁধাঁর মতো খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে! তিনটে শহর। সম্ভবত তিনটে মৃত্যু। ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা... তারপর নিজের আত্মার পৈশাচিক সমর্পণ! তিন-এ মিলে জন্ম নিয়েছে...

* * * * * * * * * *

— "ঘিদরা, G-H-I-D'-R-A!"

উজি শুই মোনোগাতারী বইটার একটা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় একটা নির্দিষ্ট শব্দের ওপর আঙুল রেখে দোয়েল তাকাল অনামিকার দিকে।

অনামিকা স্মার্ট, শহুরে মেয়ে। দোয়েলের থেকে কয়েক বছরের বড় হলেও দেখতে ছোটখাটো। মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিছু পসার হয়েছে ইতিমধ্যেই। সারা সপ্তাহ কলকাতায় থাকে, সপ্তাহান্তে হালিশহরের বাড়িতে ফেরে বাবা মার কাছে। আজ শনিবার, দোয়েলের ডাকে সে আপাতত দোয়েলের বাড়িতে এসে রয়েছে। আজ হাল্কা রোদ উঠেছে। ঈশাণ কোণে মেঘ আছে বটে তবে তা বৃষ্টি হওয়ার মতো নয়।

— "মানে কি শব্দটার?" অনামিকা ঝুঁকে পড়ে লালচে হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠার দিকে তাকালো।

— "জাপানি ভাষা," বলল দোয়েল। "ইংরিজি সরাসরি কোনও ট্রান্সলেশন হয় না। তবে 'ঘিদরা' বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যা এক হয়েও একাধিক।"

অনামিকা কিছুক্ষণ দোয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন মনে হয় তোর যে পৃথিবীর বুকে এর সৃষ্টি হয়েছে?"

— "এদিকে দেখ," বলে দোয়েল পাশের পেন স্ট্যান্ড থেকে একটা লাল পেন্সিল দিয়ে একটা পঙক্তি দাগিয়ে দিল;

Of the many forms associated with this hellish entity– the most recognizable and fearful being a humanoid form with no solid shape. Only it has three heads! Three demonic entities combined to form an entity beyond explanation– beyond comprehension– beyond any kind of vulnerability.

— "আমি ঠিক এমনই কিছু দেখেছিলাম স্বপ্নে। একবার নয়। মাঝরাতে। আবার ভোরে। দু'বার। দু'বারই এক স্বপ্ন। বল কীভাবে?" দোয়েল নিজের উত্তেজনা চাপার চেষ্টাও করল না।

— "কারণ তুই নিশ্চয়ই এর ব্যাপারে বারবার পড়ে গেছিস। এমন কিছুর ব্যাপারে পড়লে তা মনে গেঁথে যাওয়া স্বাভাবিক। তার থেকেই এই দুঃস্বপ্ন।" অনামিকা হাত নেড়ে উত্তর দিল।

মাথা নাড়ল দোয়েল। কীভাবে? কীভাবে সে বোঝাবে অনামিকাকে?

— "এবার দেখ কী বলছে এখানে; None so hateful and destructive could rise from hell because Ghidra stands for anihilation of human fertility. It exterminates life at its bud. অর্থাৎ প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার আগেই এর প্রকোপে তা বিনষ্ট হয়ে যায়! এইজন্যই এর থেকে নোংরা, ভয়ানক আর ধ্বংসাত্মক আর কিছু হতে পারে না! দেখ কাগজ খুলে। তিনটে জায়গা... একের পর এক মিসক্যারেজ, মৃত সন্তান প্রসব... কত পরিবার রোজ হাহাকারে শামিল হচ্ছে। কত শ্মশানে কত কচি শরীর পোড়ানো হচ্ছে, কবর দেওয়া হচ্ছে। এ সবই আমার মনের ভুল? সব কাকতালীয়?"

অনামিকা খানিকক্ষণ চুপ থাকল। তারপর বলল, "শিশু মৃত্যুর নিশ্চয়ই কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে দোয়েল। তা বলে এটা মানতে হবে যে এসব

ভুত-প্রেত এসে বাচ্চা মারছে?"

— "বিজ্ঞানের পরিধি তত অব্দি যতটা মানুষের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতায় কুলায়। যেদিন তার বাইরের কিছু ব্যাখ্যা পেয়ে যায় তখন তা বিজ্ঞানের আওতায় এসে যায়। ততদিন পর্যন্ত সে 'অলৌকিক' হয়ে থাকে। ঠিক যেমন তুই বললি 'ভূত-প্রেত'।"

অনামিকা হেসে ফেলল, "আমরা ঘরে বসে তর্ক ছাড়া এমনিতেও কিছু করতে পারবো না দোয়েল। আর আমরা কি ভাবছি না ভাবছি তাতে সত্যিই কারোর কিচ্ছু যায় আসে না।"

— "আমার যায় আসে, অনু!" দোয়েল সশব্দে মোটা বইটা কোলের ওপর বন্ধ করল, "এত মানুষ থাকতে আমি অত্রিকেই কেন দেখলাম? সে দানবের মতো অত্রিকে আঁকড়ে ধরছিল! অত্রি ছটফট করছিল! সব কিছু কাকতালীয় নয়, অনু। কিছু তো মানে থাকে, কিছু তো সংকেত দেয়..."

চোখ কুঁচকে গেল অনামিকার, "অত্রি কে?"

— "অত্রি সেন। লেখক। আলাদিন ছদ্মনামে লেখে।"

সোজা হয়ে বসল অনামিকা, "তুই তাকে কীভাবে চিনলি?"

— "আলাপ হয়েছিল। দেখাও করেছিলাম। বই সই করে দিয়েছিল আমায়। প্রথমবার দেখাতেই কত কথা বলল, ছোটবেলায় বাবার অভাবে ওরা দুই ভাই-বোন কত কষ্ট করে বড়... কী হোল?"

নিচের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছে অনামিকা।

— "কী বলতে চাস?" অনামিকাকে ঝাঁঝিয়ে বলল দোয়েল।

— "ওর যমজ বোনের কথা বলেছে তাই না?" ন্যাড়াভাবে বলল অনামিকা।

— "তুই কীভাবে জানলি?" উঠে দাঁড়িয়েছে দোয়েল।

অনামিকা দোয়েলের কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, "ও আমার পেশেন্ট। আজ থেকে নয়। প্রায় বছর দেড়েক। ছোট থেকে স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় ভুগত। দীর্ঘদিন ওষুধ খেয়েছে। বড় হওয়ার পর তার সাথে আসে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন। ওর আদৌ কোনও বোন নেই! কোনোদিন ছিল না!"

বাইরে রোদের আলোটা যেন হঠাৎ কমে গেল। একটা দমকা হাওয়ায় দোয়েলের টেবিলের ওপর থেকে অত্রির সই করা সমগ্রটা ছিটকে মেঝেতে এসে পড়ল। দোয়েলের ভেতরটা যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল।

— "একথা ওর মা নিজে আমায় বলেছেন। ছোটবেলা থেকেই অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ ছিল, সেই সাথে যোগ হয় একাকিত্ব আর মাইল্ড স্কিৎজোফ্রেনিয়া। ব্যাস, মনের সাথী 'যমজ বোন' চোখের সামনে বাস্তবের রূপ নেয়। এখন অবশ্য ও অনেকটাই সুস্থ। দীর্ঘদিন কাউন্সেলিং-এর পর ও মেনে নিয়েছিল যে ওর কোনও বোন নেই। তাহলে তোকে আবার সেই এক কথা বলতে গেল কেন? ও কি তাহলে আমার সামনে অভিনয় করছে? ওর কাছে কি ওর বোন এখনও বাস্তবের অঙ্গ?"

কয়েক সেকেন্ডের জন্য যেন সব চিন্তা গুম হয়ে গেল দোয়েলের... শুধু বুকের কোণায় একটু চিনচিনে ব্যাথা... একটা অদ্ভুত হারিয়ে ফেলার জ্বালা... পরক্ষণেই সোজা হয়ে বসল দোয়েল।

— "না... না... তুই ভুল। তুই ভুল অনু।"

— "ভুল?" অনামিকার চোখ কুঁচকে গেল।

— "হ্যাঁ ভুল। কারণ আমি ওর বোনের গলা শুনেছি ফোনে।"

— "কখন?"

— "রাতে। সম্ভবত অত্রির ফোন ঘাঁটছিল ওর বোন। আমি... আমি... যেই মেসেজগুলো পাঠাচ্ছিলাম ওকে, সেগুলো সম্ভবত ওর বোন দেখছিল। তারপর নিজে থেকে আমায় ফোন করেছিল। বলল ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

অনামিকা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো দোয়েলের মুখের দিকে। দোয়েল তার ছোটবেলার বন্ধু। প্রচণ্ড একগুঁয়ে, প্রচণ্ড স্বাভিমানী... কিন্তু অসম্ভব সরল...

— "রাতের বেলা মেসেজ দেখে... নিজেই ফোন করে... দোয়েল, সে তো অত্রির বোন নাও হতে পারে... অন্য কেউও হতে পারে।" অনামিকা মোলায়েম গলায় ঠান্ডাভাবে দোয়েলকে বলল।

দোয়েল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপচাপ বসে রইল। নিজের মনকে শান্ত করতে লাগল। পাশে রাখা বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে কাঁপা

হাতে খোলা চুলটাকে আনমনেই বাঁধতে বাঁধতে বলতে লাগল, "ঠিকই... আমিই বোকা... খুব বোকা..."

অনামিকা উঠে এসে দোয়েলের পাশে বসল। দোয়েল মুখ তুলে তাকালো না অনামিকার দিকে।

— "আমি চাই না আমায় নিয়ে তোর মনে অবিশ্বাস জন্মাক।" বলে অনামিকা পাশ থেকে নিজের ফোনটা তুলে কোনও একটা নম্বর ডায়াল করল।

— "কাকে করছিস?" দোয়েল অবাক হয়ে বলল।

— "অত্রিকে।"

— "আমি ওর সাথে কথা বলবো না।" দোয়েল বিরক্ত মুখে বলল।

— "তোকে বলতে হবে না। যা বলার আমি বলব, স্পীকার অন রেখে। তুই শুধু শুনে যাবি।"

প্রথম দু'বার ফোন লাগলই না। তৃতীয়বার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর জানান দিল অত্রির ফোন বন্ধ করা রয়েছে।

অনামিকা ফোনটা নামিয়ে এনে একটা দ্বিতীয় নম্বর ধরল।

— "এবার কাকে?" দোয়েল ঝুঁকে এসে জিজ্ঞেস করল।

— "অত্রির মা।" স্পীকার অন করে ফোনটা মুখের সামনে নিয়ে এসে বলল অনামিকা।

অনেকক্ষণ ফোন বাজার পর একটি গম্ভীর নারীকণ্ঠ ফোন তুলল...

— "বলুন ডাক্তার ম্যাডাম।"

অনামিকা নিজের গলাটাকে যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে বলল, "নমস্কার মিসেস সেন। অত্রির সাথে কথা বলার একটু দরকার ছিল। ও কি বাড়িতে আছে?"

— "না ম্যাডাম, ও তো আজ ভোরে বেরিয়ে গেছে। বলল নতুন গল্প শুরু করবে, তার আগে একবার পুজো দেওয়া দরকার। তাই পুজো দিতে গেছে।"

— "কোথায়?"

— "তারাপীঠ।"

শব্দটা উচ্চারণের সাথে সাথে দোয়েল প্রায় লাফিয়ে সোফা থেকে উঠে

পড়ল। বাঁ হাতে মেঝেতে পড়ে থাকা অত্রির লেখা বইটা তুলে বলল, "আমি বলেছিলাম! সবকিছু তুই বুঝিস না অনু, সব তোরা বুঝিস না! কেউ বোঝে না! বোঝে শুধু সে যে অনুভব করতে পারে। আমি পেরেছি। কিছু একটা ঘটছে যা আমাদের বোঝার বাইরে। কান পেতে শোন এতগুলো মায়ের বুকফাটা কান্না! সবাই সব বোঝে না। কারণ এটাই জগতের নিয়ম। যদি আমার এই স্বপ্নের কোনও ব্যাখ্যা না থাকতো, তাহলে অত্রি তারাপীঠ যাবে কেন? তুই এখনও কাকতালীয়র সুতো জুড়তে থাক। আমি নিজের মনকে মিথ্যে বোঝানোর রাস্তায় আর হাঁটবো না।"

দোয়েল হ্যাঁচকা টান মেরে আলমারির ওপর থেকে একটা ছোট ব্যাগ নামাল তারপর আলমারি খুলে তাতে জামাকাপড় ভরতে লাগল।

— "কি পাগলামো করছিস? কোথায় যাচ্ছিস?" অনামিকা দোয়েলের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল।

— "আজ নয় অনু। আজ এই পাগলামোটা বজায় থাক। এত মানুষ থাকতে আমিই কেন দেখলাম ওকে? একাধিকবার? ও বিপদে পড়বে অনু। এত মন্দির থাকতে ওকে তারাপীঠেই যেতে হল? তাও এমন সময়? আমায় যেতে হবে। আমি ছাড়া কেউ জানে না কী হতে পারে ওর সাথে।"

অনামিকা এবার গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "একদিনের পরিচয় তোর সাথে... তার জন্য এত বড় বিপদ ঘাড়ে নিবি? কে হয় ও তোর?"

দোয়েল সশব্দে ব্যাগের ডালাটা বন্ধ করে অনামিকার দিকে ঘুরল। অনামিকা দোয়েলের চোয়াল এত শক্ত হতে কোনোদিন দেখেনি।

— "আমার কেউ হয় না। কিন্তু তোর পেশেন্ট হয়। ঠিক যেমন ওই মরা বাচ্চাগুলোও আমার কেউ হয় না। একটু আগে তুই ব্যাখ্যা চাইছিলিস না? যেমন এই মৃত্যুগুলোর কোন ব্যাখ্যা হয় না। তেমনই কিছু সম্পর্কও জন্মায় শব্দের আড়ালে, বইয়ের পাতার গন্ধে, রাত জাগার আবেগে... সেগুলোরও কোনও ব্যাখ্যা হয় না। অত্রি সেনের জন্য আমি কিছু করতে পারবো কিনা জানি না। কিন্তু সব জেনেও যদি আমার আলাদিনকে আমি বেঘোরে মরতে দি, তাহলে সারাজীবন নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে যাবো!"

* * * * * * * * * *

আকাশ ভাঙা বৃষ্টির মধ্যে যখন পরদিন রামপুরহাট স্টেশনে দোয়েল নামলো তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। অনামিকা বন্ধুর শত বিরোধ করুক কিন্তু দোয়েলকে সে নিজের ছোটবোনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তার প্রমাণ দোয়েলকে শত বারণ করেও সে তাকে একা ছাড়েনি। বিপজ্জনক হতে পারে বুঝেও দোয়েলের সাথে এসেছে।

দু'জনে স্টেশনের বাইরে এসে দেখল চারদিক শুনসান। একে ট্রেনটা রাস্তায় বেশ দেরি করেছে, তার ওপর এই মারাত্মক দুর্যোগ। তারাপীঠে সাধারণত সপ্তাহান্তে ভিড় হয়। আজ সোমবার, সন্ধ্যার ট্রেনে এমনিতেই যাত্রীর সংখ্যা কম, তার ওপর চারদিক ঝাপসা করে দেওয়া বৃষ্টি। প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে একটা অটো পেল ওরা। রামপুরহাট থেকে তারপীঠের রাস্তা এমনি সময় চল্লিশ মিনিট লাগলেও এই দুর্যোগের মধ্যে হাইওয়ে ছাড়িয়ে গ্রামের রাস্তায় নামতেই সময় লাগল প্রায় একঘণ্টা। তার কারণ বৃষ্টির জন্য হাইওয়েতে সৃষ্টি হওয়া বড় গাড়ির লম্বা জ্যাম। দু'দিকের ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া রাস্তা চলে গেছে অন্ধকারের বুক চিরে।

— "এখানে কীভাবে খুঁজে পাবি অত্রিকে?" অনামিকা অটোর একদিকে নিজের ছাতাটা খুলে ধরে ছাঁট আটকানোর মরিয়া চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করল।

দোয়েল মাথা নাড়ল। সে সত্যিই জানে না। এক-দুবার যে তার অনুশোচনা হয়নি তা নয়। কিন্তু একবার মনস্থির করে তারপর পিছিয়ে যাওয়াটা দোয়েলের ধাতে নেই। কোনদিনও ছিল না।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে অটোটা রাস্তার ধারে কেতরে দাঁড়িয়ে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে একটা বিকট নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরল তিনজনকে। ড্রাইভার নেমে গাড়ির পেছনদিকটা দেখে এসে বলল রাস্তার পিচের চাঙর উঠে থাকায় তাতে বাড়ি খেয়ে পেছনের অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে। বিশাল জনমানবহীন অন্ধকার প্রান্তরে একটা অকেজো বাহনের সাথে আটকে

গেল ওরা তিনজন। মেঘের গর্জন আর ব্যাঙের ডাক ছাড়া দূর দূর অব্দি কোন গাড়ির শব্দ কানে এল না দোয়েলদের। সন্ধে গুজরে রাত নামলো বৃষ্টি ভেজা প্রান্তরে। দোয়েল আর অনামিকা চুপ করে বসে রইল অটোর ভেতরে। ড্রাইভারটা নিতান্তই ভদ্র, একা একাই বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তার দুদিকে হেঁটে এসে জানালো যে না রামপুরহাট এর দিকে, না তারাপীঠের দিকে কোনও গাড়ি তার চোখে পড়ছে।

— "ওই সামনে একটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে দিদিভাই। আপনারা গাড়িতে কতক্ষণ বসে থাকবেন? চলুন আমি কথা বলে দিচ্ছি। আপনারা ওখানে গিয়ে একটু বসুন, রাস্তার দিকে নজর রাখুন, নিশ্চয়ই গাড়ি পেয়ে যাবেন। আমি হাঁটতে হাঁটতে দেখি হাইওয়ের ধারের গ্যারেজটায় পৌঁছতে পারি কিনা।"

দুই বন্ধুর তখন অন্য কোনও উপায় ভাবার অবস্থা ছিল না। অগত্যা দু'জনে নিজেদের ব্যাগপত্তর নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হোল রাস্তার ধারে আলের ওপর দিয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়ানো ছোট্ট কুঁড়েটার দুয়ারে। বীরভূমের সাবেকি আটচালা কোঠার মেঠো বারান্দায় টিমটিম করে একটামাত্র লণ্ঠন জ্বলছে। দেখলেই বোঝা যায় পরিবারটির জীর্ণ দশা। গৃহস্বামী একজন নুয়ে পড়া পৌঢ় ভদ্রলোক। ড্রাইভার গিয়ে তার সাথে কয়েক মিনিট কথা বলে ফেরত এসে বলল, "খুড়োকে বলে দিয়েছি আমি। আপনারা বারান্দায় অপেক্ষা করুন। আমি তো শহরের দিকেই যাচ্ছি। কোনও গাড়ি আসতে দেখলে পাঠিয়ে দেব।"

'খুড়ো' ভদ্রলোকটিকে দেখে মনে হল নিতান্ত বিপদে পড়েছেন, আবার মানবিকতার খাতিরে কিছু বলতেও পারছেন না। অনামিকা বোধহয় তার অবস্থা বুঝে বলেই ফেলল, "আমরা বেশিক্ষণ থাকব না। বুঝতেই পারছেন, একে রাত, তার ওপর এমন আবহাওয়া...।"

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, "না না, তা নয়। আপনারা বিপদে পড়ে আমার বাড়ি দু'দণ্ড বসবেন তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আসলে দিদিভাই, আমার মেয়েটার শরীর ভালো নেই। জামাইয়ের আজ আসার কোথা ছিল, তা সে বোধহয় বাদলার কারণে আজিমগঞ্জেই আটকে পড়েছে। আমি একা বুড়ো মানুষ, কী করবো ঠাওর করতে পারছি না। আর এদিকে এই

দুর্যোগের রাতে...”

— “কী হয়েছে মেয়ের?” অনামিকা জিজ্ঞেস করল।

— “এই আটমাস চলছে গো দিদি। আজ সকাল থেকে সে বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না। এদিকে রাত হয়ে গেছে আশেপাশে কোন মেয়েমানুষও নেই যে ডাকি। এদিকে চারিদিকে শুনছি নাকি বাচ্চা মারা যাচ্ছে। আমার যে বড় ভয় করছে গো দিদি...!”

দোয়েল আর অনামিকা কাঁধের ব্যাগ দাওয়ায় ফেলে গিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে। কেরোসিনের কুপির আলোয় তারা দেখল একটা ঝরঝরে চৌকির ওপর বছর বাইশের একটি মেয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে আর জোরে জোরে শ্বাস টানছে।

— “শি ইজ ইন লেবার পেইন!” অনামিকার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল কথাটা, “সবচেয়ে কাছাকাছির হাসপাতাল কোথায় আছে?”

ভদ্রলোক বললেন, “সেই তারাপীঠ।”

অনামিকা মেয়েটির পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, “দোয়েল, রাস্তায় যা, দেখ কিছু পাস কিনা। যেভাবে হোক একে পৌঁছতে হবে।” তারপর শেষটু ইংরিজিতে বলল যাতে ভদ্রলোক বুঝতে না পারেন, “উই মাস্ট সেভ হার, ইভেন ইফ উই লুজ দ্য বেবি।”

দোয়েল উঠোন পেরিয়ে এক ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার হয়ে গেছে দু'দিকের মাঠ। দূরে হাইওয়ের আলো দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু তাও এখান থেকে কম করে দু কিলোমিটার। রাস্তার এক পাশে খারাপ হয়ে যাওয়া অটোটা পড়ে রয়েছে। নিজেকে বড্ড অসহায় লাগল দোয়েলের। হাতে ধরা মোবাইলটা জ্বালিয়ে একবার এদিক ওদিক দেখে নিল দোয়েল। নাহ, কোথাও কিচ্ছু নেই। একটা ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় এসে দাঁড়ালো সে। ঘাড়ের কাছে একটা হালকা যন্ত্রণা, বোধহয় অটোটা ঝটকা মারার সময় খিঁচ লেগেছে। সে মনে মনে জানে বাচ্চাটা হয়তো বাঁচবে না কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছতে না পারলে মাকেও যে বাঁচানো যাবে না।

হঠাৎ বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে একটা শব্দ ফালা করে দিল দোয়েলের চিন্তার জাল। ব্রেকের আওয়াজ! দোয়েল মুখ তুলে তাকাতেই দেখে একটা ট্রেকার

এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। দোয়েল তুলে ধরল মোবাইলের আলো। গাড়ির অন্ধরার ভেতরটা থেকে নেমে এল লম্বা ঝাঁকড়া চুলের এক মূর্তি। দোয়েলের হৃৎস্পন্দন থেমে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

— অত্রি!

এক মুহূর্তের জন্য এক উজ্জ্বল হাসি ঝলকে উঠল অত্রির ঠোঁটে... দোয়েল যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেল।

— "তুমি এখানে? কী ব্যাপার?" অত্রি প্রশ্নটা করল বটে, কিন্তু তাকে দেখে মোটেও মনে হোল না সে দোয়েলকে দেখে অবাক হয়েছে।

— "পুজো দেওয়ার ছিল।" দোয়েল অত্রির মুখ থেকে চোখ সরিয়ে বলল।

অত্রি আবার হাসল। সেই অন্ধকারে আলো ছড়িয়ে দেওয়া হাসি।

— "তুমি কোনোদিন লেখক হতে পারবে না। একদম মিথ্যে বলতে শেখোনি।"

দমকা হাওয়ায় গাছের পাতার জল ঝরে পড়ল দু'জনের ওপর।

দোয়েল, অনামিকা, অত্রি, সেই পৌঢ় ভদ্রলোক আর তার মেয়েকে নিয়ে যখন বামাচরণ সাধারণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছল তখন বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তারাপীঠের সড়ক সব শুনসান। একটা কুকুরও কোথাও চোখে পড়ছে না। মেয়েটিকে প্রসূতি বিভাগে ঢোকানোর সময় একজন সিস্টার বলেই বসলেন, "এখানে তো কেউ বাচ্চা হওয়ার জন্য আর আসে না। বাচ্চাটাকে তো এমনিই রাখা যাবে না। মাকে বাঁচানোরই চেষ্টা করা হবে।"

অনামিকা ঘুরে মুখ ঝামটা মারতে যাচ্ছিল, দোয়েল তার কাঁধে হাত রাখতে অনামিকা চেপে গেল। ভাগ্যিস অত্রি ভদ্রলোককে নিয়ে বাইরে ছিলেন তাই উনি শুনতে পাননি।

অনামিকা রয়ে গেল প্রসূতি বিভাগের বাইরে। দোয়েল বাইরে এসে দাঁড়ালো অত্রির পাশে। ভদ্রলোককে ভেতরের বেঞ্চে বসিয়ে অত্রি আর দোয়েল খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালো।

— "কীভাবে খুঁজে পেলে আমায়?" দোয়েল জিজ্ঞেস করল।

— "রামপুরহাট থেকে ফিরছিলাম। দেখলাম তুমি গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছো।"

— "অনামিকাকে চেনো তুমি?"

অত্রি একটু থেমে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। আমার একটা অসুবিধের কারণে ওনার কাছে যাই আমি। উনি ভালো কাউন্সেলর। উপকার পেয়েছি। উনি কি আমার ব্যাপারে আর কিছু বলেছেন তোমায়?"

ঘাড় নেড়ে না বোঝাল দোয়েল।

তারপর খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, "সেদিন রাতে তোমায় মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। তোমার বোন ফোন করেছিল। সে কী করে জানল আমি তোমায় মেসেজ করেছি?"

অত্রি উত্তর দিল না।

দোয়েল অধৈর্য হয়ে উঠল। একটু অভিমানের সুরেই বলল, "এত রহস্য তোমায় ঘিরে। মুখে কিচ্ছু বলো না। এত চাপা কেন? ভাষায় প্রকাশ করতে অস্বস্তি হয়?"

ঘাড় নাড়ল অত্রি। "সেই জন্যই তো গল্প লিখি। যাতে মুখে বলার অস্বস্তিটা না থাকে।"

দোয়েল হেসে ফেলল কথাটা শুনে। মেঘলা আকাশের চাঁদোয়ার ফাঁকে দুটো তারা জ্বলে উঠল।

— "কিন্তু তোমার এখান থেকে চলে যেতে হবে অত্রি।" দোয়েল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "বিপদ হতে পারে তোমার!"

অত্রির চোখ কুঁচকে গেল, "কীভাবে জানলে?"

দোয়েল আগের রাতের স্বপ্নের কথা বলল অত্রিকে। অত্রির অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল না সে ঠিক কী ভাবছে। শুধু দোয়েলের কথা শেষ হওয়ার পর ছোট্ট হাসি দিয়ে বলল, "সেইজন্য আমায় বাঁচাতে এতদূর ছুটে এলে?"

— "মুখে কিচ্ছু বলো না। এত চাপা কেন?" অত্রি মুখ নামিয়ে বলল।

দোয়েল অত্রির দিকে না তাকিয়েই হেসে উত্তর দিল, "সঙ্গদোষ।"

হেসে ফেলল অত্রি। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বলল ভেতরে?"

— "বলল বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাবে না। এখানে এইজন্য আর কেউ

প্রসবের জন্য আসে না।”

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল অত্রির মুখ।

— “ভেতরে যাও দোয়েল। আমায় এবার যেতে হবে।” বলে অত্রি হাঁটা লাগাল বাইরের ফটকের দিকে।

— “কোথায় যাচ্ছ?” বলে পিছু নিল দোয়েল।

— “যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভেতরে যাও তুমি।”

— “না!” গলা চড়াল দোয়েল, “আমায় জানতে হবে কেন আমি তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। কী বিপদ হবে তোমার? তুমি এখানে পুজো দিতে আসোনি। তোমার তো নিজের কোনও বোনও নেই। আমায় জানতে হবে এতটা ঝাপসা যার জীবন, তার সাথে আমি কীভাবে জড়িয়ে গেলাম যে তার বিপদ সংকেত আমি পেতে লাগলাম।”

দাঁড়িয়ে গেল অত্রি। পেছন ফিরল। অসহায়তা আর দৃঢ়তার এমন মিশেল দোয়েল কারোর অভিব্যক্তিতে এর আগে দেখেনি।

দাঁড়িয়ে গেল দোয়েল। নিজের হতাশা না চেপে রেখে অত্রির চোখের দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে প্রশ্ন করল, “কে তুমি?”

অত্রি উত্তর দিল না। সেই মুখ দৃঢ় থেকে ধীরে ধীরে করুণ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অত্রি শুধু বলল, “এস আমার সাথে।”

ঘুটঘুটে অন্ধকার তারাপীঠ মহাশ্মশানের বিরাট বিরাট গাছগুলি থেকে থেকে জ্বলে উঠছে বিদ্যুতের চমকে। পায়ের তলায় প্যাচপ্যাচে কাদা। পচা মাংসের গন্ধ আর ব্যাঙের ডাক। দোয়েলের শরীর শিরশিরিয়ে উঠল। বৃষ্টি এখন নেই। কোনও কোনও গাছের তলায় ছোটছোট ছাউনিতে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। সবকটা তান্ত্রিকদের আখড়া।

— “চুল বাঁধো দোয়েল।” অত্রির গম্ভীর গলার ফরমানে দোয়েলের খেয়াল হোল সে খোলা চুলে শ্মশানে এসে ঢুকেছে। ঝটপট বেঁধে নিল সে।

— “দেখো ওদিকে।” অত্রি আঙুল দিয়ে দেখালো সারি সারি মাটির ঢিবির

দিকে, "তারা ঘুমিয়ে আছে ভেতরে যারা চোখ খুলে কখনও পৃথিবীর আলো দেখারই সুযোগ পায়নি।"

দোয়েলের বুকের ভেতরটা জমে হিম হয়ে গেল। কষ্ট আর ভয় একসাথে যেন গলাটা শুকিয়ে দিল তার।

— "তিন তিনটে পুণ্যভূমি থেকে নরকের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে তিন শয়তান। আর তাতেই সৃষ্টি হয়েছে এমন এক দানব যে মেতেছে এই ভয়ানক ধ্বংসলীলায়!" অত্রি কথাগুলো যেন ঘোরের মধ্যে বলে গেল।

দোয়েলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটাই শব্দ ঘুরে ফিরে আসতে লাগল... 'ঘিদরা'!

— "যেখান থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছে সেখানে আর কোনোদিন নতুন মনুষ্য-প্রাণের সৃষ্টি হবে না।" বলে অত্রি থামল।

দোয়েল যেন বোবা হয়ে গেছে। তার মনের সমস্ত প্রশ্ন যেন মনেই হারিয়ে গেছে।

— "তুমি কখনও 'ভ্যানিশিং টুইন' এর ব্যাপারে শুনেছ?" অত্রি হঠাৎ গলার স্বর অনেকটা খাদে নামিয়ে বলল।

দোয়েল ঘাড় নাড়ল।

— "এমন এক অবস্থা যখন মায়ের গর্ভে যমজ বাচ্চার একজন বিলীন হয়ে যায়।" বলতে আরম্ভ করল অত্রি, "সৃষ্টির তিন বিস্তার। যেমন নরকের কিছু জীব পৃথিবীতে উত্তরণ ঘটিয়ে ফেলে পাপ ছড়ানোর জন্য, তেমনই উত্তমলোকের এমন কিছু শক্তি থাকে যাদের মনুষ্যলোকে জন্ম নিতে হয়। এই মৃত্যুলোক থেকে তাদের মুক্তির একমাত্র উপায় আত্মবলিদান। মানুষের ওপর বিস্তার করা এই অপশক্তিদের পাপমোচনের স্বার্থে।

— "এমনই এক উত্তম জাতি হোল 'কিন্নর'। যারা অন্তকাল ধরে পৃথিবীতে জন্মে চলেছে। আমি জন্মেছিলাম মানুষের গর্ভে কিন্তু আমার বাবা ছিল কিন্নরদের একজন। আমরা একাধারে পুরুষ, একাধারে নারী। কিন্তু মনুষ্যজনিতে জন্মাবার কারণে আমি প্রথমে বুঝিনি। একজন কিন্নরের জন্ম হয় মায়ের গর্ভে পুরুষ এবং নারী ভ্রূণ সম্মিলিত হয়ে। আমিই আমার বোন।

আমিই আমার ভাই। আমার মধ্যেই তার অস্তিত্ব। তার মধ্যেই আমার।”

ভিজে গায়ে দোয়েলের শরীর যেন জমে গেল। এসব কি শুনছে সে?

— “ছোটবেলায় বুঝতাম না। এই দ্বিতীয় সত্ত্বাকে মনে মনে রক্ত মাংসের বানিয়ে ফেলেছিলাম। মা ভাবল আমি অসুস্থ। বড় হতে হতে বুঝলাম আমি আলাদা। তারপর একদিন কোনও এক সময় দেখা হোল বাবার সাথে। সবার অলক্ষ্যে। জানলাম সব। কিন্তু মায়ের বিশ্বাস ভাঙতে চাইনি। তাই নিয়মিত তোমার বন্ধুকে দেখিয়ে গেছি। স্বভাব মতই তোমাকেও বলে ফেলেছিলাম ‘বোন’ এর কথা।”

হাওয়ার তাপমাত্রা যেন মিনিটে মিনিটে কমছে। দোয়েল এতক্ষণে মুখ খুলল, — “তাহলে আমি তোমার স্বপ্ন দেখলাম কীভাবে?”

— “কিন্নরদের একমাত্র ক্ষমতা, আমরা বিদেহীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। তারাও আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কিন্তু আমাদের একমাত্র দুর্বলতা। আমরা তার কাছেই নিজের নিশান ছেড়ে আসি যাদের প্রতি আমাদের টান পড়ে যায়। যেমন দুরাত্মার সংস্পর্শে এলে তার প্রভাব পড়ে যায় কোনও দুর্বল রাশির মানুষের ওপর, তেমনই আমাদের সত্ত্বার অংশও আটকে যায় তার সাথে যার প্রতি আমরা দুর্বল।”

অত্রি এগিয়ে এল দোয়েলের দিকে। ভিজে কাঁধে হাত রাখল তার। তারপর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি এখানে পা রাখার সাথে সাথে আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই নিজেই গিয়েছিলাম তোমায় নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে। আমি এখানে তোমায় আনতে চাইনি দোয়েল।”

দোয়েল চেপে ধরল অত্রির হাত। তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, “চলো, চলে যাই এখান থেকে।”

অত্রি এক পা পিছিয়ে এসে দোয়েলের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলল, “তোমাদের জগৎ আমার জায়গা নয় দোয়েল। আজ সুযোগ এসেছে নিজের উত্তোরণ ঘটানোর। কাল ভোরের আগে অষ্টগ্রহ সমন্বয় কেটে যাবে। তখন আমার মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। আজ সুযোগ এসেছে এতগুলো কচি প্রাণের মৃত্যুর বদলা নেওয়ার!”

— "না!" দোয়েল চিৎকার করে অত্রিকে ধরতে যাওয়ার আগেই চোখ ধাঁধানো আলো প্রায় অন্ধ করে দিল দোয়েলকে। দোয়েল ছিটকে সরে আসার সাথে সাথে দেখল অত্রি নিচু হয়ে হাত রেখেছে প্রকাণ্ড শিমূল গাছের গোড়ায় ছোট্ট আটচালা মন্দিরটার বেদিতে। সাথে সাথে অত্রির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে যেন বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ হতে লাগল। আর সেই ছোট্ট আধপোড়া আটচালা মন্দিরটা লাল আভায় জ্বলে উঠল।

হঠাৎ দিক্বিদিক পালটে গেল। কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো গর্জন শুরু হল মেঘের মধ্যে। দোয়েল কানে হাত দিয়ে বসে পড়ল ভিজে মাটির ওপরেই। মাটি যেন কাঁপতে শুরু করেছে দোয়েলের পায়ের তলায়। নাকি মাথা ঘুরছে তার? বিদ্যুতের ঝলকে সাদা করে দিচ্ছে বার বার অন্ধকার শ্মশানকে। অত্রি একইভাবে হাত রেখে রয়েছে বেদির ওপর। সমস্ত ছাউনি থেকে তান্ত্রিকেরা বেড়িয়ে পড়েছে এই চোখ ধাঁধানো আলোর বিচ্ছুরণ দেখে।

এবার ঝড় শুরু হল। এমন হাওয়া যেন শ্মশানের সব গাছ উপড়ে ফেলে দেবে। কী করবে? পালিয়ে যাবে দোয়েল? কথাটা মনে হতেই সারা আকাশ জুড়ে চতুর্দিকে বিজলির ঝলক খেলে যেতে লাগল। তারাপীঠ মহাশ্মশানে প্রলয় ঘটিয়ে দেওয়ার মতো তুফান শুরু হয়ে গেল। দোয়েল মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতেই তার হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। শ্মশানের গাছপালার ওপর দিয়ে কালো মেঘের আড়ালে আকাশের ওপর ফুটে উঠছে এক বিভীষিকাময় মূর্তি। বিদ্যুতের ঝলকে ধোঁয়ার মতো মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরোল তিনটে মাথা! তারপর কানফাটানো গর্জন। চিৎকার করে উঠল দোয়েল! শিমূল গাছটার ওপর আলোর ঝলকের সাথে বাজ পড়ে গাছের মগডালে আগুন লেগে গেল!

— "পালাও!"

অত্রি দোয়েলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল। দোয়েল হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক পা সরে এল বটে। কিন্তু পালানোর মতো অবস্থা তার নেই। তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেছে। জাগতিক সবকিছু ভুলে দোয়েল যেন কাঠের পুতুলের মতো এই মহাজাগতিক সংঘাতের নির্বাক শ্রোতামাত্র!

— "তুই ঠিক। তুইই ঠিক। একা পারবো না আমি। তোর ক্ষমতা আমার থেকে অনেক বেশি। আমি একা পারবো না।" বিড়বিড় করে বলে উঠল অত্রি। তারপর খনিকটা থেমে, লম্বা শ্বাস টেনে বলল, — "আয় অস্মি!"

হঠাৎ অত্রির শরীরের আলোর বিচ্ছুরণ কমে গেল। কিন্তু একি! একি হচ্ছে চোখের সামনে। অত্রির কোমর হঠাৎ নুয়ে পড়ল। মাথার চুল লম্বা হতে হতে প্রায় কোমর অব্দি পৌঁছে গেল। হাত-পা সব কিছুর গঠন বদল হতে হতে যেই মানুষটা নুয়ে পড়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালো তাঁকে দেখতে প্রায় অত্রিই মতন... কিন্তু সে-নারী!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল দোয়েল।

মেঘের গর্জন যেন একটু কমলো। হাওয়ায় অস্মির লম্বা চুল কালো দাবানলের মতো ঊর্ধ্বমুখে উড়তে লাগল... আকাশের শেই তিনমাথা অবয়বটার দিয়ে তাকিয়ে নিজের দশটা আঙুল জোড় করল অস্মি। তারপর মুখ খুলল সে। এই গলাটা দোয়েল আগে শুনেছে। ফোনে। সেদিন রাতে!

— "আজ তোদের পালা। তোদের নিয়মে খেলা চলবে। আয়, আমার সহচরেরা!"

অবাক হয়ে দোয়েল দেখল অন্ধকারে প্রায় শ'খানেক আলোর বিন্দু জোনাকির মতো ফুটে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো বড় হতে লাগল। বিন্দুগুলো এখন আর বিন্দু নেই। প্রত্যেকটা যেন আলোয় গড়া ছোট্ট ছোট্ট শিশুর শরীর। অজস্র। তারা সবাই হাওয়ায় ভেসে ঘিরে রাখল অস্মিকে।

— "যা, তোদের মায়েদের চোখের জলের ঋণ শোধ কর!" অস্মির চিৎকার শেষ হওয়ার আগেই সেই বিপুল আলোকরাশি একে একে এসে ঢুকতে লাগল আস্মির শরীরে। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল অস্মির দেহ। শেষ আলোকশিশুর শরীরটি অস্মির শরীরে মিলিয়ে যেতেই অস্মি যেন হালকা হয়ে গেল... হাওয়ায় ভেসে উঠল তার শরীর। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মাটি থেকে ভেসে উঠল হয়েক হাত ওপরে...

কান ফাটিয়ে আবার বাজ পড়ল আটচালা মন্দিরের পাশের গাছে।

— "পারবি না। পারবি না। আমি একা তোর কাছে দুর্বল। কিন্তু দেখ।

তোর শিকাররা এখন আমার শক্তি!" অস্মির গমগমে গলার স্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকল গাছে গাছে।

কালো মেঘপুঞ্জ ফুটন্ত তেলের মতো উথলিয়ে উঠল আকাশে। তাদের পেছনে দানবের মতো মেঘের গর্জনের মতো আস্ফালন করে উঠল তিনটে অতিকায় মাথার ছায়া!

দোয়েল সম্মোহিতের মতো দেখে চলেছে। অস্মি একবার ফিরল তার দিকে। তার শিরা উপশিরা দিয়ে আলো বেরোচ্ছে। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে তার। যেন এই বিপুল তেজরাশি নিজের শরীরে ধরে রাখতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তার।

— "মনে রেখো আমায়।"

সেই চোখ। সেই হাসি। শুধু শরীরটা নারীর। ভালোবাসায় কি আদৌ শরীর গুরুত্ব রাখে? কোনও এক মহাজগতের কোন এক তারায় কোথাও নাম লেখা থাকে দুটো মনের। কোথাও গিয়ে আবেগের তার জুড়ে যায় দু'জনের অজান্তেই। সেখানে মানুষ, দানব, পিশাচ, যক্ষ, কিন্নর, পুরুষ, নারী, সত্যিই কোনও কিছুরই গুরুত্ব থাকে না।

দোয়েল কিছু বলে ওঠার আগেই অস্মির শরীরটা গোলার মতো আকাশের দিকে ছিটকে গেল। তারপর মেঘের মধ্যে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ রাতের কালো আকাশ অন্ধ করে দেওয়া আলোয় ভরে গেল। সেই সাথে কান ফাটানো গর্জন। যেন অন্তরীক্ষে লক্ষকোটি পশুর গায়ে একসাথে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মেঘে মেঘে আগুনে-লাল রং ছেয়ে গেল। ঠিক সূর্যোদয়ের আগে যেমন হয়। সেই লাল আভা গ্রাস করতে করতে একসময় তিনটে মাথা মেঘের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। সেই বিপুল আলকরাশি ক্রমে কমে গিয়ে আবার অন্ধকার হয়ে গেল মেঘে ঢাকা আষাঢ়ের আকাশ।

নিচে দোয়েল দেখতে পেল না এসব কিছু। তার শরীরটা তখন মূর্ছিত হয়ে কাদায় পড়ে রয়েছে। শান্ত হল গর্জন। অত্রির শরীরের অংশে জুড়ে থাকা মেঘ দুয়ার খুলে দিল তার। বৃষ্টি নামলো তারাপীঠে। সেই বৃষ্টির ফোঁটা যেন বারংবার ভিজে চুম্বনে আবৃত করে দিতে থাকল দোয়েলের শরীর।

* * * * * * * * * *

প্রসূতি বিভাগের বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কোলাহলের শব্দে উঠে দাঁড়ালো অনামিকা।

একঝাঁক সাধু আর তান্ত্রিক স্ট্রেচারে করে জরুরী বিভাগে ঢোকাচ্ছে একটি মেয়েকে। দৌড়ে গিয়ে অনামিকা দেখে স্ট্রেচারে ভিজে গায়ে কাদা মেখে শুয়ে রয়েছে দোয়েল!

— "কী হয়েছে ওর!" আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল অনামিকা।

— "কিছু হয়নি ওর সাথে। নিশ্চিন্ত থাক মা!" তান্ত্রিকেদের মধ্যে সাধুবাবা একজন এগিয়ে এলেন, "সে এক মস্ত কাহিনী মা। তোর বন্ধুর জ্ঞান ফিরলে সে নিজেই শোনাবে।"

অনামিকা তাও সন্দেহের চোখে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে উনি বললেন, "তোর অবিশ্বাস থাকাটা স্বাভাবিক। বাইরে গিয়ে কাউকে বলবি মকুয়াবাবা দিয়ে গেছে তোর বন্ধুকে। এখানে সবাই চেনে আমায়।"

দোয়েলকে জরুরী বিভাগে ঢোকানো হোল। অনামিকা ভালো করে লক্ষ্য করেছিল। দোয়েলের গায়ে কাদা মাখা থাকলেও তার পোশাক নিয়ে যে টানা হেঁচড়া করা হয়েছে এমনটা মোটেও মনে হয় না।

টলতে টলতে এসে বেঞ্চিতে বসল অনামিকা। শীত করছে তার। বোধহয় বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর আসছে। ঘাড়টা পেছনে এলিয়ে একটু তন্দ্রা লেগে গেছিল তার। হঠাৎ একটা শব্দে মুহূর্তে তন্দ্রা কেটে গেল!

এমন একটা শব্দ যা সে আশা করেনি শুনবে। দৌড়ে এলেন পৌঢ় ভদ্রলোক। শুনশান করিডরে তখন গমগম করছে সদ্যজাত শিশুর চিল চিৎকার!

একে একে হাসপাতালের অন্য স্টাফরা এসে দাঁড়ালো করিডরে। সকলের মুখ বিস্ময়ে আধখোলা!

তারাপীঠের মাটিতে আজ আবার জীবিত বাচ্চা জন্মেছে!





তিন জগত, তিন বিস্তার, তিন অপদেবতার মিলন এক মহাজাগতিক মাহেন্দ্রক্ষণ-এ সৃষ্টি করবে এমন এক মহাপিশাচ যার উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের বহু প্রাচীন লোকগাথাতে। পৃথিবীর বুকে যার উপস্থিতিই হয় ধ্বংসের কারণ! যার অস্তিত্ব জন্ম দেয় বিনাশ আর হাহাকারের! সত্যিই কি তবে বর্তমানের বুকে ফিরে আসতে চলেছে শতাব্দী প্রাচীন লোকগাথা?

ঈশ্বরের তিন পুণ্যভূমি — পুরী, উজ্জৈন আর তারাপীঠ। এই তিন ধর্মক্ষেত্র থেকে মাথা তুলবে তিন মূর্তিমান শয়তান। অষ্টগ্রহ সমন্বয়; এমন এক অশুভ সময় যখন সৌরমণ্ডলের আটটি গ্রহ এক সরলরেখায় এসে যায়, তন্ত্র মতে এই সময়ে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই তিন জগতের আভ্যন্তরীণ পথ হয় সবচেয়ে সুগম। ঠিক এই সময়ে মিলন হবে তিন অপশক্তির। শুরু হবে ধ্বংসলীলা। যেতে থাকবে মানুষের প্রাণ।

কে দাঁড়াবে এই বিপুল শক্তিধর অপশক্তির সামনে? কার ক্ষমতা হবে তার সমতুল্য হয়ে তার বিনাশ করার?



বিভা
অলৌকিক
সিরিজ


ISBN 978-93-86548-85-6
9 789386 548856
₹ ১২৩.০০

www.bivapublication.com